কালিদাস তাঁর কালে

গল্পের বই

শ্রীসুকুমার সেন

ডি.এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী · কলিকাতা – ৬

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৭২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭১

প্রচ্ছদশিল্পী

মুদ্রক
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

শ্রীমান্ অভিজিৎ দত্ত
শ্রীমতী সুনৃতাবরী সেন
পরমকল্যাণভাজন দুটিকে

হারা মণি	১
চোরা বউ	৭
শ্লোক-চুরি	১৪
হারা ধন	২৩
রাজসভায় ষড়যন্ত্র	৩৪
ভূতের বাতাস	৪৭
অভিচার	৬২
গুপ্তধন	৬৮
কন্যাদায়	৮০
রাজকৌলীন	৯৬

হারা মণি

প্রতিদিনের মতো সেদিনও কালিদাস সকাল সকাল উঠেছেন। মুখ হাত ধুয়েছেন। স্নান করেছেন। প্রাতঃসন্ধ্যায় বসেছেন। সন্ধ্যা-বন্দনা অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা হল। আসন থেকে উঠে কালিদাস গলা ঝাড়লেন!

অমনি দাসী পাশের ঘরে উঁচু-নীচু দুখানি চৌকি পেতে দিয়ে উঁচু চৌকির উপর প্রাতরাশের সাজানো থালা বাটি রেখে গেল। আয়োজন বেশি কিছু নয়। থালায় কিছু শুষ্ক দ্রাক্ষা, অল্প পিণ্ডখর্জুর, গুটি চারেক শর্করাখণ্ড, দুটি তিলমোদক। বাটিতে গরম দুধ।

পাশের ঘরে গিয়ে কালিদাস নীচু চৌকিতে ব'সে প্রাতরাশ সারলেন। খেলেন কিসমিসগুলি তিলে মোয়া দুটি আর দুধটুকু। ইতিমধ্যে দাসী এসে পাশে একঘটি জল ডাবর আর গামছা রেখে গেছে।

ডাবরে মুখ ধুয়ে গামছায় হাতমুখ মুছে কালিদাস ধীরে সুস্থে বাইরের অলিন্দে চলে এলেন। সেখানে একান্তে পাতা রয়েছে চিত্রবিচিত্র মাদুর, তার উপর নেতের আস্তরণ—তার মাঝে সুন্দর সূতীকার্যে বিরাট এক পদ্মফুল। পদ্মফুলের মাঝখানে আসন পিঁড়ি, তার সামনে উঁচু চৌকি-ডেস্ক। চৌকির উপরে একতাড়া পুথি, তার সঙ্গে কিছু সাদা তালপাতা, কালির দোয়াত, তুলি-কলম আর কালি চোপসাবার জন্য একটি ছোট সাদা নেকড়ার সরু বালিভরা থুপি।

কালিদাস পদ্মাসনে বসলেন। তখন মেঘদূতের মার্জনা চলছে। তিনি পুথির তাড়াটি খুললেন। উপরের পাতাটি তুলে নিয়ে লেখা গুনগুন করে পড়লেন।

"জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রীত্যা কুবলয়দলপ্রাপি.....।"

তারপর ভাবতে লাগলেন "পুত্রপ্রীত্যা" ভালো ঠেকছে না। "পুত্রপ্রেম্ণা" ভালো হবে। "পুত্রপ্রীত্যা" কেটে "পুত্রপ্রেম্ণা" লেখবার জন্য তুলিকলমটি হাতে নিয়েছেন এমন সময় রথ্যাদ্বারে শৃঙ্গধ্বনি হল। সে আওয়াজে বোঝা গেল রাজপ্রাসাদের ডাক নিয়ে হরকরা এসেছে। লেখা আরম্ভ করার মুখে এই বাধা পেয়ে কালিদাসের মন অপ্রসন্ন হল। সাড়া দেবেন কিনা ভাবছেন অমনি আবার শিঙার ডাক। বুঝলেন ব্যাপারটা জরুরি। একটু রুক্ষস্বরেই বললেন, 'পবিসহু।' অর্থাৎ ভিতরে আসুন।

নাছ-দরজার তোরণ পেরিয়ে, দুপাশের পারিজাত-মন্দার অথাৎ পালিতামাদার গাছের পল্লব ঠেলে উঠানের লতাবিতানের মাঝখান দিয়ে সরু পায়েচলার পথ বেয়ে অলিন্দে এসে উঠলেন এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধযুবক—সমুন্নতকায় বিশালবক্ষ প্রসন্নমূর্তি। তাঁর প্রকোষ্ঠে স্বর্ণকঙ্কণ, মাথায় উত্তরীয় জড়ানো। রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের কঞ্চুকী, অর্থাৎ প্রধান এডিকঙ।

তাঁকে দেখেই কালিদাসের বিরক্তি ঘুচে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন। বললেন, 'আসুন আসুন, বিষ্ণুরাত। সকাল বেলায় কী ব্যাপার?'

ইতিমধ্যে দাস একটি আসনপিঁড়ি এনে দিয়েছে। কালিদাসের ইঙ্গিত পেয়ে বিষ্ণুরাত উপবেশন করতেই গাড়ু গামছা ডাবর নিয়ে দাসী এসে তাঁর পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিলে।

বিষ্ণুরাত বললেন, 'এ অভ্যর্থনার আবশ্যক ছিল না। আমাকে এখনি উঠতে হবে।'

কালিদাস বললেন, 'আপনি পাদুকাহীন কেন?'

'তোরণদ্বারে ছেড়ে রেখে এসেছি। চুরি যাবার ভয় নেই। শিঙাদার আছে পাহারায়।'

'চুরির কথা নয়। আপনি পাদুকা পরেই ভিতরে এলেন না কেন? উঠান অগোছালো। কাঁটা-খোঁচা পায়ে ফুটতে পারত।'

'কালিদাসের কবিকুঞ্জে জুতোপায়ে ঢুকতে ইচ্ছে হল না।'

'কিন্তু শিঙাদার এনেছেন কেন? পাড়ার লোকে কি ভাববে বলুন তো।'

'কিছুই ভাববে না। আপনি কী তা সকলেই জানে। যাক্—শিঙাদার আনতে হয়েছে দেবপাদের নির্দেশে। তিনি ভেবেছেন আপনি হয়ত এমনি ডাকে এত সকালে না-ও আসতে পারেন। তাই জরুরি ব্যাপার বোঝাবার জন্যে···এই আর কি।'

'হয়েছে কী?' কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন।

'খুবই গুরুতর ঘটনা। কাল সন্ধ্যার পর থেকে মহাদেবীর মণি-কুণ্ডলের একটি চুনি পাওয়া যাচ্ছে না। সেই থেকে মহাদেবী উপবাস করে আছেন।'

'চুরি?'

'বোঝা যাচ্ছে না। রোজই মহাদেবী সন্ধ্যার আগে প্রসাধন করে তার মহলের উদ্যানে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকেন। কাল সন্ধ্যার পর উদ্যান থেকে ঘরে এসে দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন এক কর্ণকুণ্ডলের বড় লাল পাথরটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ তল্লাস হল। সাজ ক'রে মহাদেবী যেখানে যেখানে পাদচার করেছিলেন সর্বত্র ধূলা-বালি মাটি-কাঁটা সব তন্ন-তন্ন করে ছেঁকে ফেলা হয়েছে। চুনি পাওয়া যায় নি।'

'চেড়ীদের কাউকে সন্দেহ হয়। পড়বার মাত্র লক্ষ্য করে কেউ যদি কুড়িয়ে নিয়ে থাকে?'

'অসম্ভব। তারা সবাই পুরানো লোক, বিশ্বস্ত। মহাদেবী নিজেকে সন্দেহ করবেন তবু তাদের নয়।'

'সামান্য একটা চুনির জন্যে এত ব্যাকুলতা কেন? রাজভাণ্ডাগারে মহামূল্য মণিমাণিক্যের তো অপ্রতুলতা নেই—যতখুসি নিতে পারেন।'

'তাহলে তো গোল মিটেই যেত। ব্যাপার অত সহজ নয়। মণি-কুণ্ডল তো রাজভাণ্ডারের দ্রব্য নয়। সেখানকার দ্রব্য তো বলতে গেলে দেবার জন্যেই আছে। এ কুণ্ডল মহাদেবীর মায়ের দেওয়া।

তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। মহাদেবীর কাছে এ কুণ্ডলের মর্যাদা তাঁর মঙ্গলসূত্রের চেয়ে কম নয়, হয়ত বেশি! মণিহারা হয়ে মহাদেবী সেই থেকে দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটেননি। চুনি না পাওয়া পেলে বুঝি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবেন, এমনি ধারা।'

'নগরপালকে জানানো হয়েছে?'

'হাসালেন আপনি। নিজের লেখা ভুলে যাচ্ছেন? নগরপালেরা কেমন তা কি আপনি জানেন না? আপনি এখন বলতে চান শুদ্ধান্তঃপুরের হারামণি উদ্ধার করবে জানুক-সূচকদের রাউত? তাছাড়া অন্তঃপুররক্ষীরা তো তাদের ঢুকতেই দেবে না।'

'তাহলে এখন?'

'এখন—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকঃ কবীন্দ্রঃ। দেবপাদের ধারণা হয়েছে, এ মণি যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো সে কালিদাস। আর কারো সাধ্য নয়। আমাকে বললেন কাতরভাবে, "মহাদেবীর প্রাণ রক্ষা করতে চাও তো কালিদাসের বাড়ী ধরণা দাও, তাকে নিয়ে এস, সে বিহিত করবেই।"

রাজার কাতর বিশ্বাস কালিদাসের মনে উদ্বেগ জাগালে। উঠানের গাছপালার দিকে চোখ রেখে কালিদাস ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'কতকগুলো জ্ঞাতব্য আছে। যদি আপনার কাছে তা পেয়ে যাই তবে আমাকে হয়ত অকুস্থলে যেতে হবে না রাজান্তঃপুরের নিষিদ্ধ ভূমিতে পদক্ষেপ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

'কী জ্ঞাতব্য বলুন।'

'মহাদেবীর প্রসাধন-কক্ষ থেকে তাঁর উদ্যান কতদূর?'

'প্রসাধন-কক্ষের কাছেই। দুটি কামরা পেরিয়ে অলিন্দ। অলিন্দ থেকে দু-তিন সোপান নামলেই মহাদেবীর ক্রীড়োদ্যানের পক্ষদ্বার।'

'ওখানে যায় কারা? যাবার অধিকারই বা আছে কাদের?'

'ওখানে যান মহাদেবী ভর্তৃদারিকারা প্রতীহারী সহচরী চেড়ীরা। দেবপাদের বাধা নেই। তবে তিনি বড় একটা যান না।'

'সুতরাং ভিতরকার কারো উপর আপনাদের সন্দেহ নেই ?'

'একেবারেই না।'

'মহাদেবী কাল উদ্যানে যা যা আচরণ করেছিলেন তা খুঁটিয়ে বলতে পারেন ?'

'হ্যাঁ, পারি—অবশ্য যথাসম্ভব। উদ্যানে গিয়ে তিনি কিছুক্ষণ পুষ্পবীথিতে পায়চারি করেছিলেন। তারপর রত্নবেদিকায় বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করেছিলেন। ময়ূরকে খই দিয়েছিলেন ছড়িয়ে। তারপর ঝুলনায় উঠে খানিকক্ষণ দোল খেয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বন্দীর গান উঠলে পর তিনি অঞ্জলি ক'রে সন্ধ্যা-প্রণাম করেছিলেন। তার পর সখীদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঘরে ফিরে এসেছিলেন। তারপর দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে দেখলেন একটি চুনি নেই।'

'ক্রীড়োদ্যানের ভূমি ভালো করে খোঁজা হয়েছে ?'

'তন্নতন্ন করে।'

'মহাদেবীর অলিন্দের নীচে পক্ষদ্বার ছাড়া ক্রীড়োদ্যানের আর কোন প্রবেশপথ আছে ?'

'না।'

'কোনরকম নির্গমন পথ আছে ?'

'জলনির্গম পথ আছে। কিন্তু তা বাইরের দিকে নয়, অন্তঃপুরের দিকে।'

'উদ্যানের প্রাচীর কত উঁচু ?'

'বিশ-বাইশ হাত হবে।'

'তাই তো !'—কালিদাস চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন। বিষ্ণুরাত চার মুখে কোন ভাবান্তর হয় কিনা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

অর্ধদণ্ডকাল বাদে কালিদাস চোখ খুললেন। বললেন, 'ভয় নেই। চোর পালায়নি, পাওয়া যাবে বোধ করি। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে মহাদেবীকে প্রবোধ দিয়ে অনশন ছাড়তে বলুন। আমার ওখানে যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি।'

বিষ্ণুরাতের মুখে হেন ছায়া নেমে এল। বললেন, 'আপনি না গেলে দেবপাদের মনোভঙ্গ হবে। মহাদেবীও কারো কথা শুনবেন না। তখন আমার অবস্থাটা কী হবে একবার ভেবে দেখুন।'

'আমার উপর আপনাদের দেখছি অগাধ আস্থা। অথচ আমার কথা মানছেন না! আমি কি তামাসা করছি? বেশ, আমি সমাধান লিখে দিচ্ছি। দেবপাদের হাতে দেবেন। তিনি ঠিক বুঝে নেবেন। আপনাকে অপদস্থ হতে হবে না। পুরস্কৃতই হবেন।'

এই ব'লে একখানা সাদা তালপাতা টেনে নিয়ে কালিদাস নিঃশব্দে তুলি বুলিয়ে দু-ছত্র কিছু লিখে দিলেন—তাঁর ইনভেস্টিগেশন্ রিপোর্ট। বলা বাহুল্য রচনাটি শ্লোকে। শ্লোকটি এই

দাড়িম্ববীজভ্রান্ত্যেব শিখিনা গ্রাসিতো মণিঃ।
অদ্য শ্বো বা হদিষ্যেত বর্চস্তদ্ অনুচিন্ত্যতাম্॥

(অর্থাৎ, দাড়িম্বের বীজ মনে করে ময়ূর চুনিটিকে উদরস্থ করেছে। আজকালের মধ্যেই তা পেট থেকে বেরিয়ে যাবে। তার বিষ্ঠা ভাল করে লক্ষ্য কর' হয় যেন।)

লেখা পাতাটি পাতলা দুটি চন্দন কাঠের মাঝখানে রেখে কালিদাস পট্টডোর দিয়ে বাঁধলেন। বেঁধে কঞ্চুকীর হাতে দিলেন।

বিষ্ণুরাত বললেন, 'খুলে একবার দেখতে পারি কি?'

'অবশ্য, অবশ্য। আপনি আসামীও নন, আসামীর সাহায্যকারীও নন। আপনার কাছে গোপনের কি আছে!'

কঞ্চুকী ডোর খুলে পাতাতে চোখ বোলালেন আর তখনি ঘাড় নেড়ে ডোর দিয়ে দিলেন। বললেন, 'কিছু বোঝা গেল না।—কুটলিপি।'

'আপনি কি এরই মধ্যে যবনানী ভুলে গেছেন? আশ্চর্য। দেবপাদ নিশ্চয়ই ভোলেননি। ভুললেও তাঁর যবনী অঙ্গরক্ষিণী পড়ে দেবে। সেও যদি ভুলে গিয়ে থাকে তাহলে তখন আমাকে যেতেহবে।'

বিষ্ণুরাতের মুখ উদ্ভাসিত হ'ল। অভিবাদন করে বিদায় নিলেন। কালিদাস লেখায় মন দিলেন॥

চোরা বউ

কালিদাসের স্ত্রী ইন্দুমতী বললেন, 'ওগো আজ বিকালে তোমার এক মক্কেল আসবে।'

'সে কি তুমিও দেখছি মক্কেলের দালাল হলে? কিসের মক্কেল? সরস্বতীর পদ্মালয়ে প্রবেশের শলাকাপ্রার্থী মক্কেল নয়ত?'

'না না, কোন উদ্বাহু যেমন বামন নয়। তবে বামনী বটে। রহস্যভেদের খরিদদার।'

'তবু ভাল। কে?'

'আমাদের পাড়ারই একটি বামুনের মেয়ে। সেই যার স্বামী মাথা নেড়া করে গেরুয়া পরে বিবাগী হয়ে গেছে। যার ছেলেকে তুমি চাকরি ক'রে দিয়েছ কৌশাম্বীতে।'

'ও বুঝেছি। বীরভদ্রের স্ত্রী। শুনেছি বীরভদ্র এখন মৃগদাবে মূলগন্ধকুটীবিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘে রয়েছে। তা কী হয়েছে?'

'তার মুখেই শুনো।'

অতঃপর নীরবে কালিদাসের মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত হল।

অপরাহ্নে কালিদাস বাড়ীর বাগানে ঘাসের উপর আসন পেতে বসে আছেন। একটু পরে ইন্দুমতী এক বর্ষীয়সী মহিলাকে নিয়ে সেখানে এলেন। পিছু পিছু আসছিল দাসী। সে কালিদাসের সামনে দুটি আসন বিছিয়ে দিলে। ইন্দুমতী ও তাঁর প্রতিবেশিনী, বীরভদ্রের স্ত্রী যশস্বিনী, আসনে উপবেশন করলেন। কালিদাস মাথা একটু নত করে যশস্বিনীকে স্বাগত জানালেন। তারপর তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার কী এমন সমস্যা হল?'

'সমস্যা এমন কিছু জটিল নয়, সামান্যই। তবে সাংসারিক এবং মেয়েলি ব্যাপার। প্রকাশ্যে খোঁজ খবর আমি করতে পারতুম কিন্তু

তাতে লোকজানাজানি হয়ে যাবে। ব্যাপার খুবই তুচ্ছ তবে যাকে বলা যায় স্ত্রীলোকঘটিত। আপনাকে আমরা অন্তর্যামী বলেই জানি। আপনি শুনেই হয়ত সমাধান করে দেবেন। আর আপনার কাছে আমাদের ঘরের কথা কিছু লুকোছাপা নেই। তাই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।'

'বেশ। বলুন।'

'আজ বছর দেড় হল আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছি। গ্রামে, এখান থেকে দু তিন প্রহরের পথ। বিয়ের পর এক বছর বউ বাপের বাড়ীতেই ছিল। তারপর ঘরে এনেছি। ছেলেমানুষ মেয়ে। আমাদের পাড়ার এক রকম কাছেই বলতে পারি বউয়ের মামার বাড়ি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাই ঘরটান একটু বেশি হতে পারে বলে আমি তাকে দুচার দিন অন্তর মামার বাড়ীতে বেড়াতে যেতে বলতুম। সে তাই করত। আজ প্রায় পক্ষকাল হল আমাকে আর বলতে হয় না। বউমা রোজই মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। অপরাহ্নে যায় সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসে।'

'তাতে দোষ কিছু ঘটেছে?'

'না দোষ কিছু হয়নি। আমাকে বলেই যায়। তবে আজ কদিন হল লক্ষ্য করছি, বউমা প্রায়ই একটা ছোট তেলের ঘটি হাতে যায়।'

'তাতে করে কি তেল নিয়ে যায়?'

'বলতে পারি না। আমি দেখিনি। বউমাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে। বড় ছেলেমানুষ নেটিপেটি।'

'তা আমাকে কী করতে বলেন?'

'আপনাকে বলতে হবে ও কেন রোজ রোজ মামার বাড়ী যায়, আর তেলের ঘটি নিয়েই বা কী করে। আমি ওর মামার বাড়ী গিয়ে খোঁজ করতে পারতুম। কিন্তু তাতে লোক জানাজানি হবে। একেই তো ওঁর কীর্তিতে জ্বলেপুড়ে রয়েছি। তার উপর আর কানাকানির

সৃষ্টি করতে চাই না। বউয়ের যদি কিছু দোষও থাকে তো আর ঘাঁটাঘাঁটি হতে দেব না। চুপিচুপি বাপের ঘরে পাঠিয়ে দেব।'

'রামভদ্র তো বিদেশে। বাড়ীতে এখন তো আপনারা দুজন। ছোট সংসার। বউকে বাপের বাড়ী পাঠালে তিষ্ঠুবেন কী করে?'

'এক পুরনো দাসী আছে। আগে যেমন চলত তেমনিই চলবে। তবে বউটার উপর মায়া পড়ে গেছে। বড় ভালো মানুষ। ছেলেমানুষ, —আমার হাতের কাজ টেনে নিয়ে সব আপনি করতে যায়। গাছপালা ভালোবাসে। শাকসব্জি ফুলের গাছ আজিয়েছে বাড়ির হাতায়। আর প্রায়ই বলে, "মা একটা গোরু কিনুন, আমি তার সব কাজ করব। আমাদের বাড়ীতে গোরু আছে, আমার মামাদের আছে।"

কালিদাস একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা! আমি সন্ধান করছি। আপনি পরশু এমনি সময়ে আসবেন। বউমাকেও সঙ্গে করে আনবেন। তাঁকে দেখব। বউমার মামার বাড়ীর ঠিকানাটা দিন, আর বাপের নামধামও বলুন।'

পরের দিন সকালে কালিদাস মহামন্ত্রী শারদানন্দকে লিখে পাঠালেন, 'দেবপাদকে বলে বেতাল ভট্টকে এখনি একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। একটু কাজ আছে। সে কাজ আমার নয়, আপনাদেরই।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেতাল ভট্ট এসে হাজির। কালিদাস তাকে নিয়ে একান্তে বসে বালিকাবধূর মাতুলালয়ে নিত্যগমনের বৃত্তান্ত বললেন। তারপর তাকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি আজই খবর করবে বউটি মামার বাড়ী গিয়ে কী করে। আমার মনে হয়, গোরুর সেবা করে। তা যদি হয় তবে সে গোরুর ইতিহাস সব জেনে এসো।'

বেতাল যখন তদন্ত ক'রে ফিরে এল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সাগ্রহে কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খবর আনলে বল।'

'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। মেয়েটি মামার বাড়ী গিয়ে

একটি গোরুর পরিচর্যা করে। তার মানে তাকে কিছু টাটকা ঘাস কচিপাতা খেতে দেয়, তার গায়ে হাত বুলোয়। তার খুরে শিঙে তেল মাখায়, গোরুটা ওর হাত চাটে। তবে গোরুটা বুড়ো। বাছুর নেই। দুধ দেয় না।'

'গোরুটা কি বরাবরই ওদের ওখানে আছে?'

'না। কিছুদিন আগে মেয়েটি ওই গোরুটাকে এনে তার মামাকে বলে, "এ গোরুকে তোমাদের গোয়ালে স্থান দিতে হবে।" ভাগনীর কথায় মামা রাজি হয়ে গোরুটাকে পুষছেন।'

'যেদিন মেয়েটি গোরু এনেছিল সেদিন কি হাট বার ছিল?'

'হ্যাঁ, সেদিন ছিল গোরুবাছুরের হাট বার। মেয়েটি হাট থেকেই গোরু কিনে এনেছিল বলে মনে হয়।'

'তোমাকে আরও একটু খাটতে হবে। তুমি একবার মেয়েটির বাপের বাড়ী গিয়ে খবর নিয়ে এস ওরা গতবারের হাটে কোন গোরু বেচতে পাঠিয়েছিল কি না। কাল দুপুরের আগেই কিন্তু খবর আনা চাই।'

'যে আজ্ঞে।'

বেলা ছয় দণ্ড হতে না হতেই বেতাল খবর নিয়ে এল। বললে, 'ওরা একটা বুড়ো গাই সেদিনকার হাটে বেচতে পাঠিয়েছিল। গোরু ফিরে আসেনি, নিশ্চয়ই বিক্রি হয়ে গেছে।'

কালিদাসের মুখ প্রসন্ন হল। তিনি বেতালের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ভালো ভালো। এখন তোমার ছুটি।'

কালিদাসকে প্রণাম করে বেতাল উধাও হল।

বেলা তৃতীয় প্রহর শেষ হতে চলেছে। বউকে নিয়ে প্রতিবেশিনী যশস্বিনী কালিদাসের বাড়ীতে হাজির হলেন। নববধূর অভ্যর্থনার জন্যে ইচ্ছামতী যথাপযোগী আয়োজন করে রেখেছিলেন। শয়নকক্ষের

প্রশস্ত দক্ষিণখোলা অলিন্দে তাঁদের বসানো হল। তারপর কালিদাস এলেন, একটা চৌকিতে বসলেন নববধূ উঠে এসে কালিদাসকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর ইন্দুমতীকে আর শাশুড়ীকেও প্রণাম করলে। কালিদাস আশীর্বাদ করলেন, 'চিরায়ুষ্মতী ভব।' বললেন, 'বেশ বউ হয়েছে।' ইন্দুমতী বউয়ের হাতে দুগাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলেন। শাশুড়ীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মেয়েটিকে উদ্দেশ করে কলিদাস বললেন, 'শুনলুম তুমি নাকি গোরুর সেবা করতে খুব ভালোবাস। মামার বাড়ীতে গিয়ে যে গোরুটিকে রোজ ঘাসপালা খাইয়ে ও শিঙে খুরে তেল মাখিয়ে আস ও গোরুটি কি আগে তোমার বাপের বাড়ীতে ছিল?'

মেয়েটি মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, 'হাঁ ওটি আমাদেরই গোরু। আমি যখন দেড় বছরের তখন আমার ঠাকুরদাদা আমার খাবার দুধের জন্যে ওটিকে কিনেছিলেন। তখন ওর প্রথম বিয়ান। আমি ওরই দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। ওর মেয়ে নাতিপুতিরা আমাদের বাড়ীতে এখন দুধ দেয়। ও বুড়ো হয়েছে আর দুধ দিতে পারে না।' মেয়েটির মুখ ছলছল করে উঠল।

'তাই বুঝি বেচতে হাটে পাঠানো হয়েছিল? তা ঠিকই তো। ডাকে বলে

বুড়া গাই বস্ত্র পুরানা।
যে বেচে সে বড় সেয়ানা॥

লজ্জায় ঘাড় নুইয়ে মেয়েটি বললে, 'দুধ বন্ধ হবার পর থেকেই আমার ঠাকুরমার ইচ্ছে ছিল গোরুটাকে বিদায় করে দেন। আমি তা করতে দিইনি। আমি ওকে যেমন ভালোবাসি ও আমাকে ঠিক তেমনি ভালোবাসে।'

'তুমি শ্বশুর ঘর করতে এলে পর তবেই বিক্রি করবার বাধা দূর হয়েছিল। তা তোমার বাবা মা কিছু বলেন নি?'

বাবার মত ছিল না, মায়েরও নয়। ঠাকুরমারও যে বেচবার খুব

ইচ্ছে ছিল তা নয়। তবে মা একদিন মুখ ফুটে বলেছিলেন, ''ও দুধ দেয় না বলে ওর অযত্ন হচ্ছে। ঘরের গোরু বুড়ো হয়েছে, কোথায় যাবে?" মা যা বলবেন ঠাকুরমা ঠিক তার উলটোটি ভাববেন। মায়ের কথায় ঠাকুমা জেদ করতে লাগলেন বেচবার জন্যে। আমিই কান্নাকাটি করে বেচতে দিইনি।'—বলে মেয়েটি ঘামতে লাগল।

'তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? ঠিকই করেছ। তা সেদিন হাটে যে ওকে বেচতে আনা হয়েছে তার সন্ধান পেলেই বা কী করে?'

'যে রাখাল ওকে এনেছিল সে জানত গোরুটার উপর আমার টান কেমন। হাটে গোরুটাকে বেঁধে রেখে আমাকে খবর দেয়। আমি নদীতে নাইতে যাবার ছল করে হাটে এসে গোরুটাকে দেখি। আমাকে দেখেই ও ঘাড় নেড়ে লাফাতে শুরু করে। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করে চলে আসি সটান মামার বাড়ীতে। মামাকে বলি, "মামা আমাকে আজ একটা গোরু কিনে দিতে হবে, তাকে তোমার গোয়ালে রাখতে হবে। তোমার যা খরচ হবে আমি পরে গয়না বেচে শোধ করব।" মামা অবাক হয়ে বললে, "তোর শাশুড়ীকে বললি না কেন?" আমি বললুম, ''কোন্ লজ্জায় শাশুড়ীকে বলব? গোরুটা যে বুড়ো, অনেককাল থেকে দুধ দেয় না।" মামা তখন জিজ্ঞাসা করে সব কথা জেনে নিলেন। তারপর মামার সঙ্গে গিয়ে হাট থেকে গোরু কিনে নিয়ে এলুম। তারপর মামাদের পুকুরে স্নান করে বাড়ী ফিরে এলুম।

'সেই থেকে আমি থাকতে পারি না, রোজ একবার করে মামার বাড়ী যাই গোরুকে দেখতে ও দেখা দিতে। লজ্জায় শাশুড়ীকে কোন কথা জানাতে পারিনি। খুব অন্যায় কাজ করেছি।'

তেলের ঘটির কথা কোন পক্ষই উত্থাপন করলে না। নিষ্প্রয়োজন।

কালিদাস বললেন, 'দেখতে গেলে একটু অন্যায় কাজ হয়েছে। ভাবতে গেলে কিছুই অন্যায় হয়নি। তোমার শাশুড়ী কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি, তুমিও কিছু সত্য-মিথ্যা উত্তর দাওনি। তোমরা

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করেছ। কোনো পক্ষে বলবার কিছু নেই।'

যশস্বিনীর দিকে চেয়ে কালিদাস বললেন, 'বেশ লক্ষ্মী মেয়ে। এইবার গোরু রাখুন। রামভদ্র বাড়ী এলে ক্ষীর খাবে, আর আমারও কোন না এক আধ দিন শীতল ভোগ পাব। শাস্ত্রে বলে "গোব্রাহ্মণহিতায় চ"—মানে, ব্রাহ্মণের সুবিধার জন্যে গোরু পুষবে।'

আপনার রসিকতায় আপনি হাসতে হাসতে কালিদাস উঠে গেলেন। একটু পরে শাশুড়ী-বউও স্বস্থানে প্রস্থিত হলেন।

পথে যেতে যেতে শাশুড়ী বউকে বললে, 'বউমা কালই তোমার মামাকে বলে তোমার গোরু বাড়ীতে আনিয়ে নেব। আর তোমার বাবাকেও আমি খবর দেব, এবার তোমাদের কইলে বাছুর হলে যেন আমাদের দেয়। তোমার ছেলেপুলে হলে তারা দুধ খাবে।'

বউ-এর বুক দুলে উঠল॥

শ্লোক-চুরি

বিক্রমাদিত্যের আমলে উজ্জয়িনীতে খুব জাঁকজমকে বসন্ত-উৎসব পালিত হত। সে উৎসব একদিনেই চুকে যেত। তারপরে ছোটখাটো দু-একটি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান চলত জের টেনে। সে সব অনুষ্ঠান জনসাধারণের নয়, তাই তার পসার বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। এমনি একটি অনুষ্ঠান—উৎসব ঠিক নয় অধিবেশন বলতে পারি—ছিল সাহিত্যগোষ্ঠী। যে-কালের কথা বলছি তখন উজ্জয়িনীতে কালিদাস সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপস্থিতিতে সাহিত্যগোষ্ঠীর অধিবেশনের গৌরব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সাহিত্যগোষ্ঠীতে গান হত, কবিতা-পাঠ হত, নাটক-অভিনয় হত, শাস্ত্র ও সাহিত্য বিচার চলত, নতুন ও ভালো গল্প শোনাও যেত। তবে সব বারে সব কিছুই ঘটত না। ভালো গায়ক না থাকলে গান হত না, নতুন নাটক প্রস্তুত না থাকলে অথবা নতুন ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী না জুটলে অভিনয় হত না, বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মর্জি না হলে সাহিত্যবিচার চলত না, বিদেশ থেকে ঘুরে আসা সার্থবাহ অথবা পরিব্রাজক না থাকলে গল্প-কথা হত না। তবে একটা কাজ সব বারেই হত। সে কবিতা-পাঠ। সভায় উপস্থিত যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে পারতেন। সে কবিতা নতুন ও ভালো না হলেও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। তরুণ অথবা বয়স্ক নবীন কবিদের রচনা আগ্রহ করে শোনা হত। তাঁদের ভালো কবিতার পুরস্কার-ব্যবস্থা খুব মোটা রকম ছিল না বটে, কিন্তু সে পুরস্কারের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। যে নবীন কবি শ্রেষ্ঠ বলে পুরস্কৃত হতেন তাঁর সংসারের সকল ভার পড়ত রাজভাণ্ডারীর উপর।

এ বছর বসন্ত-উৎসবের জের টেনে আজ সাহিত্যগোষ্ঠী বসেছে।

স্থান উজ্জয়িনী নগরপ্রাকারের বাইরে রাজোদ্যান। কাল—প্রথম অপরাহ্ণ। বিস্তীর্ণ মাধবী-কুঞ্জবিতানে আসর পাতা হয়েছে। আসরের শীর্ষপ্রান্তে কর্তাব্যক্তি প্রধান কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের একটু উচ্চাসন, গেরুয়া কম্বলে মোড়া। তারপর দুপাশে পুরস্কার-প্রার্থী কবি গায়ক ও অন্যান্য প্রতিযোগী কর্মকারকদের স্থান, লাল কম্বলে ঢাকা। উচ্চাসনের সামনে একটু স্থান ফাঁকা, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগীরা আত্মপ্রকাশ করে গুণপনা দেখাবেন। আসরের বাকি সব স্থান শ্রোতা ও দর্শকদের জন্যে—সবুজ কম্বল বিছানো।

সভা প্রস্তুত। বিক্রমাদিত্য এসেছেন। কালিদাসও হাজির। আসরের গেরুয়া মণ্ডলের মাঝখানে বিদগ্ধ তাঁরা বসেছেন। রাজা একটু উঁচু চৌকিতে, কালিদাসেরা একটু নীচু চৌকিতে। রাজার বাঁয়ে কালিদাস, ডাইনে যহামন্ত্রী শারদানন্দ। রাজার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর প্রধান প্রতীহার অগ্নি শর্মা ও বেতাল ভট্ট। বিদগ্ধ মণ্ডলের মধ্যে একটুও ফাঁক নেই। প্রধান কবি বিচক্ষণ পণ্ডিত ও দক্ষ রাজসভাসদ তাঁরা যে যেখানে পেয়েছেন বসে পড়েছেন। মাধবী-বিতানের দ্বারদেশে আসরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র দুজন রাজপ্রাসাদের প্রহরী। আসরে প্রবেশ করতে কারও বাধা নেই। যখন আর ঠাঁই থাকবে না তখন প্রহরীরা কাউকে ঢুকতে দেবে না।

আসর ঠাসাঠাসি ভরে গেল। দেখে শারদানন্দ তাঁর ডান হাত তুললেন। দ্বারপ্রান্তে প্রহরী তাঁর দিকে চেয়ে ছিল। নির্দেশ পেয়ে অমনি তারা মাধবী-বিতানের প্রবেশপথ রোধ করলে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে।

কালিদাস রাজার দিকে মুখ তুললেন। রাজা একটু ঘাড় কাত করলেন।

কালিদাস আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।' বলেই বসলেন। সভা আরম্ভ হল। পরিচালনা করতে লাগলেন শারদানন্দ।

ঘণ্টা চারেক পরে তরুণ ও নবীন কবিদের পালার ডাক পড়তেই একটি ছেলে তড়াক করে যেন লাফিয়ে উঠে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সুদর্শন কিশোর, গৌরকান্তি দীর্ঘকায় ঝামর চুল। বয়স সতেরো-আঠারো।

হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মাথা নামিয়ে রাজাকে নমস্কার করে সে বললে, 'আমি সর্ববর্মা, রুদ্রবর্মার পুত্র। বসন্ত-বর্ণনা শ্লোক লিখেছি পড়ব ?'

শারদানন্দ বললেন, 'পঠিঅদু।'

সর্ববর্মা পড়তে শুরু করলে

'বসন্তে উশন্ ত্বম্.....'

'অবিহা, অবিহা'—বলতে বলতে একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। সে সর্ববর্মার আগেই এসেছিল। তবে সর্ববর্মা আসবার পর থেকে ছেলেটি যেন উস্‌খুস করছিল। এখন শ্লোক পড়া হতেই সে আর থাকতে না পেরে অবিচারের দোহাই পেড়ে বাধা দিলে।

শারদানন্দ হাত নেড়ে ছেলেটিকে বসতে বলে সর্ববর্মাকে ইঙ্গিত করলে পড়ে যেতে।

সর্ববর্মা একটু দমে গিয়ে সরু গলায় পড়তে লাগল

'বসন্তে উশন্ ত্বম্ উৎসুকো যদি স্যা
দিনান্তে বনান্তে একান্তে বিহর্তুম্।
স্ফুরন্তং শশাঙ্কং গগনে দিদৃক্ষুস,
ত্বরংস্ত্বং গৃহান্তং জিহীথা জিহীথাঃ॥

পড়া শেষ হলে শারদানন্দ বললেন, 'বস।' সর্ববর্মা গিয়ে নিজের স্থানে বসলে পর শারদানন্দ সেই ছেলেটিকে সামনে আসতে বললেন।

'কে তুমি ? কি অবিচার বোধ হয়েছে তোমার ? দেবপাদের সামনে দোহাই পাড়লে কেন ?'

কমনীয়কান্তি শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, লাজুক, চুল কদমছাঁট, বয়স ষোল-সতেরো। বললে, 'আমার নাম সুহিতদত্ত, পিতার নাম

শ্রীসুজিত দত্ত। ও যে শ্লোক পড়লে সে ওর নয় আমারই রচনা।'

'কি তোমার প্রমাণ?'

'আমাদের বয়স্য সবাই জানে আমি শ্লোক লিখতে পারি, ও পারে না। গেল বছরে সাহিত্য-গোষ্ঠীতে আমি শ্লোক পড়েছিলুম, ও কখনো কিছু পড়েনি।'

শারদানন্দ ভাবনায় পড়লেন। রাজা কালিদাসকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'তুমি বিহিত করো।' কালিদাস ঘাড় কাত করলেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। কালিদাসকে ভার দিয়েছি।'

কালিদাস শারদানন্দকে বললেন, 'আসর থেকে কাউকে বাইরে যেতে দেবেন না।' শারদানন্দ প্রহরীদের হুকুম দিলেন, আসরের কোন লোক বাইরে যাবে না।

সুহিতদত্ত তখনো দাঁড়িয়ে আছে। কালিদাস বললেন, 'কাছে এস।' ছেলেটি কাছে এল।

'ওকে ভালো করে চেন?'

'খুব চিনি। আমরা একসঙ্গে পড়ি। আমাদের বাড়ীর কাছেই সর্ববর্মারা থাকে। ওর বাবা নেই। ওরা ধনী লোক। ওদের বাড়ী আমি যাই, সর্ববর্মাও আমাদের বাড়ী কখনো কখনো আসে।'

'তোমাদের মধ্যে ঝগড়া আছে?'

'না।'

'ওকে কি তোমার রচিত এই শ্লোক দেখিয়েছিলে? পড়তে দিয়েছিলে?'

'না। ও শ্লোক আমি কাউকে শোনাইনি পড়তেও দিইনি।'

'তবে কবে কখন কি করে তোমার শ্লোক ও চুরি করলে বল।'

'শ্লোকটি আমি কদিন ধরেই মনে মনে গড়ে আসছি। কাল সকালে ঠিকঠাক করে লিখে রেখেছিলুম। লেখা তালপাতাটি সাদা পাতার তাড়ার তলায় গোঁজা ছিল। আজ সকালে এখানে আসবার জন্যে

প্রস্তুত হতে গিয়ে দেখলুম পাতার তাড়া ঠিকই আছে কিন্তু তলার পাতটির লেখা সব যেন জল পেয়ে মোছার মতো হয়ে গেছে। তালপাতার তাড়ার তলায় লেখা পাতড়া। তাতে জল লাগে কি করে। আমার মনে এমন কষ্ট হল যে শ্লোকটি আর কিছুতেই সবট মনে আনতে পারলুম না। ভেবেছিলুম সাহিত্য-গোষ্ঠীতে আসব না। পরে ভাবলুম যাই, যদি সেখানে গিয়ে শ্লোকটি মনে পড়ে যায়। সর্ববর্মা যেই বললে, "বসন্তে উশন্ ত্বম্" অমনি সব শ্লোকটি আমার মনে গেল। আমি আর থাকতে পারলুম না।'

'কাল তোমাদের বাড়ীতে বাইরের লোক কে কে এসেছিল।'

'না, বাইরের লোক কেউই আসেনি।'

'সর্ববর্মা এসেছিল?'

'এসেছিল একবার বিকালে। আমি তখন বাড়ীতে নেই। অল্পক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলুম। তবে থাকেনি সে, তখনি চলে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, নিজের স্থানে গিয়ে ব'স। সর্ববর্মাকে আসতে বল।'

সুহিতদত্ত সরে গেল। সর্ববর্মা এসে দাঁড়াল।

'তুমি কাল সুহিতদত্তদের বাড়ি গিয়েছিলে?' কালিদাস প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ।'

'কখন?'

'বিকালে। সুহিত বাড়ি ছিল না। তার মা আমাকে একটু বসতে বললেন। আমি বেশিক্ষণ না বসে চলে এলুম।'

'কতক্ষণ ছিলে? দণ্ডটাক?'

'না, অতক্ষণ হবে না। আধদণ্ডের মতো।'

'কোথায় অপেক্ষা করলে?'

'বাইরের ঘরে।'

'সুহিত কোথায় লেখাপড়া করে?'

'ওই ঘরে।'

'তুমি ওর পুঁথিপত্র ঘেঁটেছিলে?'

'না।'

'আর কেউ সে ঘরে ছিল?'

'কেউ ছিল না। ওর মা অলিন্দে বসে সূচিকর্ম করছিলেন।'

'তুমি কোন কিছু দ্রব্য সেখান থেকে নিয়ে যাও নি?'

'আজ্ঞে না। সুহিতের মা দেখেছেন, আমি খালি হাতে ঘরে ঢুকেছি, খালি হাতে বেরিয়ে গেছি।'

'তুমি শ্লোক লিখতে পার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে লিখে কখনো কাউকে শোনাই নি বা দেখাই নি।'

'কেন?'

'সবাই আমাকে বড় ঠাট্টা করে।'

'যে শ্লোক আজ এখানে পড়লে ওটি তোমার নিজের লেখা না আর কারো?'

'আজ্ঞে না, ওটি আমারই স্বরচিত।'

'বটে। আচ্ছা বলত, তোমার শ্লোকে "উশন্" শব্দটির অর্থ কী? ওতে কী বিভক্তি আছে? শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?'

সর্ববর্মা মুখ কালো করে চুপ করে রইল।

'চুপ করে রইলে কেন? ভুল-ভাল হয় যা হোক উত্তর একটা দিয়ে ফেল।'

'উষা শব্দের সম্বোধন পদ, একবচন। মানে, হে উষা।'

রাজার মুখে হাসি ফুটল। আসরে অট্টহাসি উঠল।

কালিদাস বললেন, 'আচ্ছা ব'সগে। সুহিতকে আসতে বল।'

সুহিত এল। কালিদাস বললেন, 'সর্ববর্মাকে যে প্রশ্ন করলুম তা তোমাকেও করছি। পার তো উত্তর দাও।'

'বশ্ ধাতুতে শতৃ-প্রত্যয়, পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন। মানে,

বাসনা করছ যে তুমি।

'বেশ। ব'সগে।'

রাজার দিকে ফিরে কালিদাস মৃদুস্বরে বললেন, 'দেব, এখন অগ্নি আর বেতালকে এখনি একবার চাই।'

রাজার ইঙ্গিতে অগ্নি শর্মা আর বেতাল ভট্ট কালিদাসের কাছে এগিয়ে এল।

অগ্নি শর্মাকে কালিদাস ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি এখনি সর্ব-বর্মাদের বাড়ীতে যাও। কাল ও যে সব কাপড় চোপড় পরেছিল, এড়া হোক কাচা হোক সব তুমি সাবধানে সন্তর্পণে নিয়ে এস। কোনোখানে কাউকে কিছুই বলবে না। কারও বাধা মানবে না।' বেতাল ভট্টকে বললেন, 'তুমি সুহিতদত্তদের বাড়ী যাও। কাল বিকালে সর্ববর্মা ওদের বাড়ী গিয়ে কি করেছিল না করেছিল সব বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে ওর মায়ের কাছ থেকে জেনে এস। কাউকে কিছু বলবে না। যেতে আসতে দেরি করবে না।'

অগ্নি শর্মা ও বেতাল ভট্ট তখনি ছুটল।

বেলা পড়ে এসেছে। দর্শক-শ্রোতারা বহির্দেশে গমনে সমুৎসুক। রাজা তন্দ্রামগ্ন, ফুড়ুং ফুড়ুৎ করে তাঁর নাক ডাকছে। শারদানন্দ মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। কালিদাস চুপ করে ভাবছেন। অকস্মাৎ জনতার গুঞ্জন থেমে গেল। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে ঝড়ের বেগে অগ্নি শর্মা প্রবেশ করলে। এগিয়ে এসে কালিদাসের কাছে পুঁটুলিটা রাখতে তিনি বললেন, 'পিছনে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখ কাপড়ে বা চাদরে কোন রকম কালির দাগ আছে কিনা।'

অগ্নি শর্মা কাপড়ের পুঁটুলিটা নিয়ে পিছনে সরে গেল। একটু পরে একটা চাদর এনে কালিদাসের হাতে দিলে। চাদরট হাতে নিয়ে কালিদাস সর্ববর্মার দিকে চাইলেন। দেখলেন সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কালিদাস চাদরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে এক আঁচলের কোণের

দিকে খানিকটা অস্পষ্ট লেখার ছাপ পেলেন। মনে হল কেউ যে চাদরের খুঁটটা লিপির উপর মষীশোষকরূপে ব্যবহার করেছে। তখন কালিদাস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপরে চাদরটা শারদানন্দকে দিলেন। শারদানন্দ দেখে বললেন, 'এতো দু ছত্র লেখার উলটো ছাপ দেখছি।'

এমন সময় বেতাল ভট্ট ফিরে এল। কালিদাস বললেন, 'কী খবর আনলে?' বেতাল ভট্ট যা বললে তাতে মোটামুটি সুহিত দত্তের কথাই সমর্থিত হল। সুহিতের মা সর্ববর্মাকে বাইরের ঘরে বসতে বলেছিলেন। সে খানিকক্ষণ বসেও ছিল। তারপর কাজ আছে বলে চলে যায়। সে শুধু হাতে এসেছিল, শুধু হাতে চলে গিয়েছিল।

কালিদাস বেতাল ভট্টকে সেই চাদরের খুঁট দেখিয়ে বললেন, 'এই কালির লেখাটা অস্পষ্ট এবং উলটো। তুমি চেষ্টা করে যতটা পার এর পাঠ উদ্ধার করে দাও, এখনি।'

সভার এক কোণে গিয়ে বেতাল ভট্ট চাদরের খুঁট নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারপর তার খুঙ্গি থেকে টুকরো ভোজ পাতা নিয়ে লাল খড়ি দিয়ে কিছু লিখলে। তারপর সেই লেখাটা এবং চাদরটা কালিদাসকে দিলে। কালিদাস দেখলেন,—সেই শ্লোক। তিনি রাজাকে দেখালেন, রাজা শারদানন্দকে দেখালেন।

কালিদাস ছেলে দুটিকে এগিয়ে আসতে বললেন। তারা সামনে এসে দাঁড়াল। কালিদাস সুহিতদত্তকে বললেন, 'তোমাদের বহিঃকক্ষে কোনো জলাধার থাকে?'

সুহিত বললে, 'হাঁ থাকে। জলভরা গাড়ু ও গামছা।'

কালিদাস তখন রাজার দিকে ফিরে বললেন, 'দেব, শ্লোক সুহিত-দত্তের রচনা, সর্ববর্মা চুরি করেছিল। কাল সে ওদের ঘরে গিয়ে তালপাতার তাড়ার নীচে শ্লোক-লেখা পাতড়াটি দেখতে পেয়েছিল। সে জানতো শ্লোকটা সুহিত আজ এখানে পড়বে। প্রথমে সে হয়ত হিংসা করে মুছে দিতে চেয়েছিল। শ্লোক পড়ে কিন্তু তার লোভ হয়

গাড়ুর জলে চাদরের খুঁট ভিজিয়ে শ্লোকটির ছাপ নেয় আর পাতড়ার লেখাটি মুছে দেয়। তাড়াতাড়িতে ভালো করে মুছতে পারেনি। যদি পরিষ্কার করে মুছে দিয়ে যেত তাহলে ওর অপরাধ প্রমাণ এমন সুসাধ্য হত না। যাই হোক, আপনি রায় দিন।'

রাজা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'শ্লোকটি সুহিতদত্তের রচনা। সে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে। সর্ববর্মা চোর এবং মিথ্যাবাদী। তবে তার বয়স অল্প, তার পিতা বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী ছিলেন। তাই তাকে চোরের শাস্তি দেব না। ওরা যেন পক্ষকালের মধ্যে উজ্জয়িনী থেকে বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। সুহিত, শ্লোকটি এবার পড়।'

'সাধু, সাধু।'—একবাক্যে জনতা অনুমোদন করলে।

সুহিতদত্ত দাঁড়িয়ে উঠে কোনরকমে শ্লোকটি পড়লে।

'বসন্তে উশংস্ ত্বম্ উৎসুকো যদি স্যা
দিনান্তে বনান্তে একান্তে বিহর্তুম্।
স্ফুরন্তং শশাঙ্কং গগনে দিদৃক্ষুস্
ত্বরংস্ ত্বং গৃহান্তং জিহীথা জিহীথাঃ॥'

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, প্রতিষ্ঠানে সুস্থিতদত্তকে খবর পাঠাও। সে যেন পুত্রের পুরস্কার লাভের খবর পায়।' সভায় ধ্বনি উঠল, 'সাধু, সাধু।'

রাজা বসলেন। কালিদাস উঠে সভাসমাপ্তি-মঙ্গল উচ্চারণ করলেন।

"সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ সর্বম্ সমাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥"

সভাভঙ্গ হল। কালিদাসের প্রতি বিরূপ এক প্রবীণ কবি উঠে যেতে যেতে মুখবিকৃতি করে মন্তব্য করলে, 'বললে তো বটে, সর্বস্ তরতু দুর্গাণি, এখানে তা হল কই॥'

১ 'বসন্তে মন উচাটন হলে তুমি যদি দিনশেষে নির্জনে আরাম পেতে চাও, যদি কিরণমালী চাঁদকে গগনতলে উদ্ভাসিত দেখতে চাও, তবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেও, বেরিয়ে যেও॥'

হারা ধন

শেষ শরতের অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছে, সূর্য পাটে বসেছেন। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কালিদাস এক পুঁথির পাতার উপর চোখ বোলাচ্ছেন।

'ওগো শুনছ?'

কালিদাস পুঁথির পাতা থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'কী বলছ বল।'

'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী সর্বনাশ?' পুঁথির পাতা রেখে দিয়ে কালিদাস পত্নীর মুখের দিকে চাইলেন। 'কী হল!'

'তথাগতর ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কী! কখন থেকে? কোথা থেকে?'

'ওরা এসেছে, কাঁদাকাটি করছে। ওদের কাছেই শোন।'

ইঙ্গিত করতেই দাসী কালিদাসের উদ্যানরক্ষী তথাগত ও তার স্ত্রী সুলোচনাকে সেখানে নিয়ে এল। সুলোচনা হাউমাউ করে কেঁদে কালিদাসের পা জড়িয়ে ধরলে। 'বাবা, আমাদের বাঁচাও। আমাদের সুগতকে এনে দাও।'

কালিদাস বললেন, 'ছেলে পাবে, চুপ কর। এখন ব্যাপারটা আমাকে বল।'

সুলোচনা কাঁদতেই লাগল। তথাগত বললে, 'রোজ যেমন তেমনি সুগত দুপুর বেলায় আমাকে ভাত খাবার জন্যে দোকানে ডাকতে গিয়েছিল। আমি বললুম, তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

'এই রকমই কি রোজ হয়?'

'হাঁ। তবে যেদিন আমি তৈরি থাকি সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসি। যেদিন দেরি হয় সেদিন সুগত কখনো কখনো অপেক্ষা করে আমার সঙ্গে ফেরে, কখনো কখনো সে আগেই ফিরে যায়। আজ সে আগেই ফিরেছিল। কিন্তু বাড়ী পেঁছয় নি।'

সুলোচনার দিকে চেয়ে কালিদাস বললেন, 'কিগো, এই রকমই বটে তো?'

সুলোচনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘাড় কাত করলে।

সাত-আট বছরের ছেলে সুগত প্রিয়দর্শন মধুরভাষী বিনীত। দম্পতীর একমাত্র সন্তান, কালিদাস ও ইন্দুমতীর অত্যন্ত আদরের। প্রতিবেশীরা সকলেই স্নেহ করেন। এমন ছেলে দিবা দ্বিপ্রহরে উজ্জয়িনীর প্রশস্ত রাজপথে অর্ধদণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অন্তর্হিত হবে, এ ভারি অসম্ভব কথা। কোথাও লুকিয়ে নেই তো? না সব স্থানে, সব প্রতিবেশীর বাড়ী ঘরে, সব দোকান পাটে তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কোথাও নেই।

কালিদাস চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তথাগতর দিকে চেয়ে বললেন, 'এস।' এই বলে নাগদন্ত থেকে উত্তরীয় টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালেন। ঘরের বাইরে পা দিতেই ইন্দুমতী বললেন, 'চললে কোথায়?'

'সুগতর খোঁজে।'

'তবে জুতো বদলাও।'

ইঙ্গিতে দাস উপানৎ এনে দিলে। কালিদাস কাষ্ঠপাদুকা ছেড়ে পানই পরলেন। দাস হাতে লাঠি জুগিয়ে দিলে। তথাগতকে নিয়ে কালিদাস বাইরে এসে রাজপথে পা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হলেন। প্রথমে গেলেন তথাগতদের বাড়ীর দুয়ারে। সেখান থেকে দুপাশ দেখতে দেখতে চলল্লেন তথাগতর দোকানে। তথাগত পুষ্পবীথিতে ফুলের দোকান করে। তারা বৌদ্ধ, বংশানুক্রমে উজ্জয়িনীর মহাবিহারে ফুল যোগায়। তার নিজের ভালো ফুলবাগান আছে, কালিদাসের বাগানের পাশেও কালিদাস তাকে স্নেহ করেন, সে

কালিদাসের বাগানের তদ্বির করে।

তথাগতর দোকানের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কালিদাস বললেন, 'চল ফিরে যাই জিজ্ঞাসা করতে করতে।' পুষ্পবীথির পরেই গন্ধবীথি। সেখানে সব মশলাপাতি ও সুগন্ধ দ্রব্যের দোকান। গন্ধ-বীথির সামনের দোকানে গিয়ে কালিদাস বললেন, 'আজ দুপুরে এই তথাগতর ছেলেকে কেউ দেখেছিলে?'

কালিদাস ও তথাগতকে আসতে দেখে সেখানে দু-চার জন লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একজন বললে, 'সুগত তো রোজই আসে। তবে আজ তাকে দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না।'

'ভালো করে ভেবে দেখ। তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সেই থেকে।'

শুনে সকলেরই মুখ ভার হয়ে গেল। একজন আধবুড়ো লোক এগিয়ে এসে বললে, 'আমি আজ তাকে খানিক আগে বাড়ীর দিকে ফিরে যেতে দেখেছি।'

'সঙ্গে কেউ ছিল কি?'

'না সঙ্গে কেউ ছিল না। পিছনে পিছনে সেই কাপালিকটা যাচ্ছিল।'

'কে কাপালিক?'

'একটা কাপালিক এই সময়ে এই পথ দিয়ে যায় প্রায় রোজই।'

'ভিক্ষে করে?'

'কিছু চায় না। কেউ কিছু দিলে ইচ্ছে হলে নেয়।'

কালিদাস একটু চিন্তিত হলেন। তথাগতকে বললেন, 'তুমি দেখেছ আজ সেই কাপালিককে?'

'হাঁ দেখেছি। সুগত যখন আমার কাছে এসেছিল তখন সে আমার দোকানের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার পর আর তাকে লক্ষ্য করিনি।'

সেই আধবুড়ো লোকটার দিকে ফিরে কালিদাস বললেন, 'আজ

সে সময়ে পথ নীরব জনবিরহ ছিল কি ?'

'না, পথে কিছু লোকজন ছিল। আর একটা বিয়ের দল যাচ্ছিল।'

'কোন্ দিকে ?'

'ওই দিকে'—বলে তথাগতদের বাড়ীর দিকে দেখিয়ে দিলে।

'তুমি তখন ঠিক কোথায় ছিলে ?'

'আমার এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছিলুম।'

'বিয়ের দল কখন গেল ? সুগত যাবার আগে না পরে ?

'একটু পরে। বলতে পারেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।'

'বিয়ের দল লক্ষ্য করেছিলে ?'

'হাঁ। বর ও কনে দুটি চতুর্দোলে যাচ্ছিল। সঙ্গে বিস্তর লোকজন বাদ্যভাণ্ড।'

'তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল ? না ধীরে ধীরে ?'

'ধীরেও নয় জোরেও নয়।'

'বিয়ের দল চলে গেলে কী হল লক্ষ্য করেছিলে ?'

'না। তারপর আমি দোকানের ভিতর চলে গিয়েছিলুম।'

আর কেউ কিছু সংবাদ দিতে পারলে না।

তথাগতকে নিয়ে কালিদাস সটান মহামন্ত্রী শারদানন্দের কাড়ীতে গেলেন।

শারদানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে অসময়ে কেন হে প্রকাশ! ব্যাপার কি ?'

কালিদাস সবিশেষ বৃত্তান্ত জানালেন।

শারদানন্দ চিন্তিতমুখে বললেন, 'ভাবনার কথা বটে। আজ তো অমাবস্যা।'

কালিদাস বললেন, 'ভরসা এই যে নিশীথ হতে এখনও বিলম্ব

আছে। এই তো সবে সন্ধ্যা আসছে।'

শারদানন্দ দেবপাদের কাছে জরুরি বার্তা পাঠালেন, অগ্নি শর্মা ও বেতাল ভট্টকে এখনি চাই।

অগ্নি—লোকে তাকে জানত "তাল" বলে—আর বেতাল এসে গেল। কালিদাস অগ্নিকে বললেন, 'তুমি এখন খোঁজ নিয়ে এস কোথায় কোন্ বাড়ীতে সে বর-কনে পৌঁছেছে।' বেতালকে বললেন, 'তুমি কাপালিকদের সর্বত্র গোরু-খোঁজা কর। শ্মশানভূমিতে পাহারা বসিয়ে দাও। আজ রাত্রিতে কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান হবে না। সেই কাপালিক বেটাকে যেখানে পাও ধরে নিয়ে নিয়ে এস। মধ্য রাত্রি যেন না পেরোয়।'

রাত্রি দেড় যাম অতীত হয়েছে। শুকনো মুখে কালিদাস ও শারদানন্দ বসে বাইরের দিকে চেয়ে। তথাগত ঘরের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঢুলছে। কালিদাস ও মহামন্ত্রী যে কাজে হাত দিয়েছেন তা সিদ্ধ হবেই—এই ভরসায় তার মন অনেকটা ভারমুক্ত।

দমকা হাওয়ার মতো অগ্নি ও বেতাল এসে হাজির হল, দুজনে কাপালিকের দুটো হাত টানতে টানতে। কাপালিকের রাঙা চোখ অজানা ভয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে। কোথায় তার কপালপাত্র, কোথায় তার লৌহদণ্ড।

কালিদাস কাপালিককে বললেন, 'ছেলেটাকে কোথায় রেখেছিস শীঘ্র বল্।'

কাপালিক ইঙ্গিতে জানালে, সে এখন মৌনব্রতী।

শারদানন্দ কালিদাসকে বললেন, 'দণ্ডপাণিকে ডাকব নাকি?'

কালিদাস বললের, 'বেটাকে যন্ত্রণা দেওয়া অনাবশ্যক। এর হাতে এখনও ছেলের কিছু অনিষ্ট হয়নি।'

'তাহলে এখন?'

'দাঁড়ান দেখি।' বলে কালিদাস তাল-বেতালকে বললেন, 'একে

তোমরা ধরলে কোথায় !'

তাল বললে, 'আমি সব কাপালিকের আড্ডা ঘুরে শ্মশানে পাহারা বসিয়ে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছিলুম এমন সময় দেখি একটা বিয়েবাড়ীর উলটো দিকে এ বেটা হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই বাড়ীর দরজার পানে। আমি এসে ওর ঘাড় ধরতেই দেখি অন্যদিক থেকে বেতাল এসে পড়েছে।'

বেতাল বললে, 'আমি খোঁজ করতে করতে এই বিয়েবাড়ীর কাছে আসতেই দেখি বেটা চুপ করে ওত পেতে আছে। আমি যেন বিয়ে-বাড়ীর নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি এই ভাবে কোন দিকে না চেয়ে সোজা-সুজি বিয়েবাড়ীতে ঢুকে গেলুম। তারপর একজন কর্মকর্তাগোছের লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ কী ব্যাপার মশাই ? এমন শুভ দিনে বাড়ীর কাছে একটা মূর্তিমান্ অমঙ্গল কাপালিককে বসিয়ে রেখেছেন কেন ?" ভদ্রলোক বললেন, "কি করব মশায়, ওটা বর-কনের যাত্রী দলের সঙ্গে সঙ্গে এসে বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছিল আমরা তাড়া করে ভাগিয়ে দিয়েছি। ও একটু দূরে বসে আছে, আছে। ওখানটা তো আমাদের জায়গা নয়, তাড়াই কি করে।" আমি বললুম, "আমি বেটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক বললেন, তা হলে আপনি আহার সেরে নিন।" আমি বললুম, "তার তাড়া নেই। আগে আপনাদের অমঙ্গলটাকে দূর করি।" তারপর আমরা দুজনে ওকে পাকড়ে আনলুম।'

কালিদাস যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন। শারদানন্দকে বললেন, 'ছেলে ভালো আছে। আজ রাত্রিতে আর বিয়েবাড়ীতে গোলমাল করে কাজ নেই। একে অন্ধ-কারাগারে রাখুন। তথাগত বাড়ী যাক। আমি আজ আপনার এখানেই থাকি।'

তথাগতকে বাড়ী যেতে বলায় সে বললে, 'ছেলেকে না নিয়ে আমি বাড়ী ফিরতে পারব না।'

'তবে তুমিও আজ রাত্রিতে মহামন্ত্রীর অতিথি হও।'

তাল-বেতাল কাপালিককে নিয়ে গেল। শারদানন্দ অন্দরে গেলেন অতিথিচর্যার ব্যবস্থা করতে।

মহামন্ত্রীর আতিথ্য বিশ্ববিশ্রুত। তার উপর অতিথি স্বয়ং কালিদাস। কিন্তু কালিদাস ভোজনে বসে আজ কিছুই খেতে পারেন নি। বিছানায় রাতও এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়েছেন। তথাগতকে বলেছেন, সে ছেলে ফিরে পাবে। কিন্তু তার ঠিক সন্ধান তো এখনও হয়নি। একটা বড়ো অনুমান করেছেন মাত্র। কিন্তু সে অনুমান যদি না খাটে। সুগতকে যদি না পাওয়া যায়। কালিদাস আর ভাবতে পারলেন না। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের অলিন্দে পায়চারি করে শেষ রাতটুকু পুইয়ে দিলেন।

সকাল হতে না হতেই কালিদাস প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরোবার জন্যে তৈরি। তথাগত পাশের ঘরে তখনও ঘুমুচ্ছে। তাকে উঠিয়ে দিতে ইচ্ছা হল না। কালিদাস মহামন্ত্রীর ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় অধীর হলেন।

দাস এসে তাঁকে অন্দরে যেতে ডাকলে প্রাতরাশের জন্যে। কালিদাস বললেন, 'আমার ক্ষুধা নেই, কিছু খাব না। একটা মোদক আর এক ঘটি জল এনে দাও। এখানেই খাব আর মহামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এখনই বেরুব।'

দাস ভিতরে গিয়ে একথা বলতেই শারদানন্দ বাইরে বেরোবার সাজ পোষাক পরে বেরিয়ে এলেন। তার সঙ্গে এল তিনজন দাস, তিন' পাত্র ভোজনীয় ও তিন ঘটি জল নিয়ে।

শারদানন্দ বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে জলযোগ করব। তথাগত কই?'

'এখনও ঘুমুচ্ছে।'

'আহা, ঘুমুক।'

দাস এক থালা খাবার এক ঘটি জল ফেরত নিয়ে গেল।

শারদানন্দের প্রশান্ত উৎসাহব্যঞ্জক মুখ দেখে কালিদাস খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন। যথোপযুক্ত প্রাতঃরাশও করলেন। তারপর বললেন, 'আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন নাকি ?'

'নিশ্চয়, দুটো দোলা সাজাতে বলেছি। অগ্নি-বেতালকে সঙ্গে নেব কী ?'

'না কোন আবশ্যক নেই। তবে এক কাজ করুন। একবার ভিতরে যান, নববধূকে দান করা যায় এমন কিছু বস্তু নিয়ে আসুন।'

শারদানন্দ বাড়ীর ভিতরে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন হাতে একটি মাঝারি সাইজের হাতীর দাঁতের কৌটো।

দাস এসে জানালে, চতুর্দোল প্রণীত।

শারদানন্দ কালিদাসকে বললেন, 'চল।' তারপর দাসকে বললেন, 'যিনি ঘুমুচ্ছেন উনি উঠলে ওঁকে পরিচর্যা করে এখানে রাখবে। কোথাও যেতে দিয়ো না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে চতুর্দোলে উঠলেন। শারদানন্দ বাহকদের ঠিকানা দিলেন সেই বিয়েবাড়ীর।

বিয়েবাড়ীর সামনে এসে চতুর্দোল দুটি থামল। তখনও উঠান সাফ সম্পূর্ণ হয় নি। রাজবাড়ীর চতুর্দোল দুটি দরজার সামনে নামতে দেখে বাড়ীতে বিষম গণ্ডগোল লেগে গেল। বাড়ীর কর্তা, বরকর্তা, প্রায় মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে এলেন, তাঁদের সমাদর করে সজ্জিত মণ্ডপে বসালেন। মহামন্ত্রীকে দেখে আভূমি নত হয়ে বললেন, 'আমার দ্বারে মহামন্ত্রী, এ কী সৌভাগ্য।' কালিদাসকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি কে মহাপুরুষ ?'

'ইনি কালিদাস।'

'এঁ্যা, কালিদাস—ইনিই ?'

কালিদাস হেসে বললেন, 'কল্পনার সঙ্গে মিলল না বুঝি ?'

'যাক্। আপনার কাছে কাজে এসেছি।'—শারদানন্দ বললেন।

'আদেশ করুন।'

'আপনার পুত্রবধূকে আমরা আশীর্বাদ করব। যেমন সাজে আছে তেমনি নিয়ে আসুন।'

কর্তা কাঁপতে কাঁপতে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ভিতরের দিকে গেলেন। একটু পরে নববধূকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে নিয়ে এলেন। কনে এসে প্রথমে কালিদাসকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পদ-ধূলি নিলে তারপর শারদানন্দকে প্রণাম করলে।

কালিদাস বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মা, তুমি আমাকে চেন কি?'

মেয়েটি ঘাড় নোয়ালো।

কালিদাস বললেন, 'তোমাকে আমি তো চিনি না। তবে তোমার মুখ যেন চেনা লোকের মুখের মতো বোধ হচ্ছে।'

'আমি মহাসাঙ্ঘিক বিহারের বুদ্ধকায়স্থ বুদ্ধরক্ষিতের কন্যা,' মেয়েটি বললে।

'তুমি বুদ্ধরক্ষিতের মেয়ে? এত বড় হয়েছ! তোমাকে তো ছেলেবেলায় খুব দেখেছি। তুমি আমাকে "কাইদাদা" বলতে। অনেকদিন তোমাদের ওখানে যাইনি। রাজসভায় তোমার বাবাও আর বড় আসেন না, আমিও আর বড় যাই না। আশীর্বাদ করি নিরুদ্বেগে নিরাময়ে সুখে থাক।'

এই বলে তিনি তার মাথায় হাত দিলেন। তারপর বললেন, 'সেই ছেলেটি কোথায়।'

'সুগতর কথা বলছেন? সে ভিতরে আছে। আমি যখন আসি তখনও সে ঘুমুচ্ছে।'

কালিদাস ও শারদানন্দের মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

মুখ কাঁচুমাচু করে মেয়েটি বললে, 'আমার ভারি অন্যায় অপরাধ হয়ে গেছে। তার বাড়ীর সন্ধান করে খবর দিতে পারিনি।'

'না করছে বেশ করেছ। এখন ওকে পেলে কি করে বল।'

'দ্বিপ্রহরের একটু পরে আমাদের দল যখন পুষ্পবীথি গন্ধবীথি

সেক্যকারবীথি এই সব গলি পেরোচ্ছিল তখন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটি ছোট ছেলে হাঁ করে শোভাযাত্রা দেখছে আর তার পিছনে একটা ভীষণমূর্তি কাপালিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই আমার ভয় হল। কেমন যেন মনে হল কাপালিকটা নিশ্চয়ই ছেলে-ধরা। ছেলেটিকে দেখে যেন চেনা চেনাও মনে হল। আমার দাসী চতুর্দোলের পাশে পাশে চলছিল। তাকে বললুম, "চতুর্দোল এখানে একটু রাখতে বল আর ওই ছেলেটিকে আমার কাছে ডেকে আন।" দাসী ছেলেটিকে নিয়ে এল, দেখলুম কাপালিকের ক্রূর দৃষ্টি সর্বক্ষণ ছেলেটির উপর। ছেলেটিকে দাসী কোলে করে তুলে ধরলে। আমি তখন তাকে বললুম, "তুমি আমার সঙ্গে বিয়ের বাড়ী যাবে?" সে বললে, "যাব, তবে মা তো বকবে।" আমি বললুম, "তোমার বাবার নাম কি? ও বললে, "তথাগত।" আমি বললুম, "তোমার বাবা কোথায়? তুমি কী জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছ।" ছেলেটি বললে, "আমার বাবার ফুলের দোকান আছে। তাঁকে আমি ডাকতে গিয়েছিলুম, রোজই যাই।" ছেলেটির বাপকে আমি চিনি। সে আমাদের মহাবিহারে গন্ধমাল্য জোগায়। আমি বললুম, "আমি তোমার বাবাকে চিনি, মাকেও জানি। আমার সঙ্গে গেলে তাঁরা বকবেন না। চল। দেখে-শুনে খাওয়া দাওয়া হলে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।" ছেলেটি রাজি হল।

'আমাদের বাড়ী পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। শুনলুম কাপালিক শোভাযাত্রার পিছু পিছু আমাদের বাড়ী পর্যন্ত এসে দুয়ারে থানা দিয়েছে। সেইজন্য সুগতকে বাড়ী পাঠাতে আমরা ভরসা করিনি। তবে ওদের বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। আমি নতুন কনে কী করব, আর ওঁরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত। সুতরাং ত্রুটি আমারই হয়েছে।'

এই বলে নববধূ কালিদাস ও শারদানন্দের পুনরায় পাদবন্দনা করলে।

শারদানন্দ এইবার মুখ খুললেন। বললেন 'মা', ত্রুটি তোমার হয়নি, ত্রুটি হয়েছে আমাদের। কাল অমাবস্যা ছিল, কাপালিক ওকে ধরতে পারলে নিশীথ রাত্রিতে দেবীর কাছে, বলি দিত। আমাদের ত্রুটি এই যে এমন হিংস্রজীবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চরতে ফিরতে দিয়েছি। তুমি দেবপাদের মান বাঁচিয়েছ। কি আর বলব। যা চাই তোমার তাই হোক, আর এই আশীর্বাদীটুকু গ্রহণ কর।'

হাতির দাঁতের কৌটাটি বধূর হাতে দিলেন। বধূ কৌটার ডালা খুললে। ভিতরে রত্নহার ঝকমক করে উঠল। মেয়েটি আবার তাঁদের প্রণাম করলে। বললে, 'সুগতকে এনে দিচ্ছি।' শাঁক বেজে উঠল। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে উৎসবমণ্ডপে পা দিয়েই কালিদাসকে দেখতে পেয়ে সুগত নববধূর হাত ছিনিয়ে দৌড়ে এসে কালিদাসের কোলে মুখ গুঁজলো। কালিদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমাদের বাদ দিয়ে তুই একলাই কাল বিয়ের ভোজ খেলি?'

রাজসভায় ষড়যন্ত্র

সেবার উজ্জয়িনীতে বসন্ত উৎসব খুব জমেছিল। বাইরে থেকে অনেক কবিপণ্ডিত সমবেত হয়েছিলেন। শেষদিনের শেষ কাণ্ড ছিল রাজকুলে কবিপণ্ডিতের সমাবেশ।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে বহিরাগত কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম যিনি—কুমারলাত—কালিদাসকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমাদের একটা গুরুতর পরামর্শ আছে।'

কালিদাস বললেন, 'তা হলে আপনারা সকলে নয়, দুচার জন আমার কুটীরে যদি পায়ের ধুলো দেন তবে পরামর্শের সুবিধা হয়, আমিও কৃতার্থ হই। কোন অসুবিধা হবে না। যানবাহনের ব্যবস্থা করব।'

'কৃতার্থ তো আমরাই হব। এই সুযোগে সরস্বতীর পদ্মবনের মধুচক্রটির পরিদর্শন ঘটবে। বলতে কি আপনার দেখা পেতেই বসন্ত উৎসবে আসা।'

'আপনারা ক জন আসবেন?'

'আমি একলাই যাবো। ঘোঁট করে লাভ নেই।'

'ঠিক কথা। কানাকানি চার কানের বেশি হলেই গুণগুণানি তার পরেই কেকাবাচ্চি। আপনি তো মহাবিহারে আছেন। অপরাহ্ণ ছ সাত দণ্ড হলে আপনাকে আনতে যান যাবে।'

'নরযান পাঠাবেন না। আমাদের ধারণায় পদযানই প্রশস্ত। তবে স্থান খুব পরিচিত নয় আর আমার শরীরও খুব সুস্থ নয়। বয়সও হয়েছে। গোযানে যেতে পারি।'

'তাই হবে। তাহলে কিন্তু গাড়ী দু এক দণ্ড আগে যাবে।'

চার বলীবর্দে টানা রাজকীয় গোশকট রথ্যাদ্বারে লাগতে কালিদাস বেরিয়ে এসে কুমারলাতকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে নিজের পাঠশালায় নিয়ে এসে বসালেন। কুমারলাত তাঁর প্রীতি-উৎফুল্ল দৃষ্টি মহাকবির গ্রন্থাগার ও কর্মশালায় আদ্যোপান্ত বুলিয়ে নিলেন। যথারীতি দাস পাদ্য ও নির্মঞ্ছনী নিয়ে হাজির হল। সৌগত পণ্ডিত সে দাসকৃত্য স্বীকার করলেন না। নিজেই পা ধুয়ে আপন বীবর-প্রান্তে মুছে নিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। এইবার আসন গ্রহণ করলেন।

কুমারলাত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কী লিখছেন?'

'ইক্ষাকুদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে কাব্য রচনায় আস্তে আস্তে হাত দিয়েছি। খানিকটা এগিয়েওছে। কয় দিন বাদ পড়েছে। আজ রাত্তিরে হাত দেব ভাবছি। আজ দিনটি পুণ্য, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

'কী যে বলেন আপনি। আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

'না লজ্জা দেওয়া নয়। সত্য কথা। আপনি মহাযানের পথে ধাবমান আর আমি এখনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'ও আপনার ভুল ধারণা। মহাযান এক নয় অনেক। যেখান থেকেই ধরা হোক না কেন সব পথই চলেছে একই ধ্রুবতারার লক্ষ্যে —"নিখিলসত্ত্বরাশের্ অনুত্তরসুখাবাপ্তয়ে"। সুতরাং সে সবই তো মহাযান। আমিও মহাযানিক আপনিও মহাযানিক। তফাতের মধ্যে আমি শাক্যভিক্ষু, ধ্যানপথে মহাযানিক আর আপনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ধারণাপথে মহাযানিক। তা সে কথা থাক এখন কাজের কথা বলি।'

কুমারলাত একটু থেমে বললেন, 'শুনেছি আপনি একদা কোন এক রাজসভায় বিদ্যাবিরোধী রাজ-কবিপণ্ডিতকে অপদস্থ করে দিয়ে সে

রাজসভায় কবিপণ্ডিতের সমাগম নির্বাধ করেছিলেন। সে কাহিনী লোকমুখে বিকৃতভাবে প্রচারিত আছে। আপনার মুখে সত্যঘটনাটি আমি শুনতে চাই। তার পরে আমাদের সমস্যাটি উপস্থাপন করব। আমাদের সমস্যাটিও এই ধরণের।'

'সে অনেক দিনের কথা তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর হবে। কিংবা তারও আগে। চলিত গল্পটার গোড়ার দিক ঠিক তবে শেষের দিক অন্যরকম। রাজসভায় রাজা ও সভাপণ্ডিতের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে কোন উক্তি প্রত্যুক্তি হয় নি, আমিও সে শ্লোকটি পূরণ করিনি।'

'সে শ্লোকটি আমার জানা নেই। বলুন তো।'

'পণ্ডিত আমাকে পিছনে করে আমার শ্লোক-লেখা পত্রটি হাতে নিয়ে রাজার সামনে হাজির হয়ে বললেন, "রাজন্‌ন্‌ অভ্যুদয়োঽস্তু।"১ রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্লন-কবে হস্তে কিম্‌ আস্তে তব।"২ পণ্ডিত বল্লন উত্তর করলেন, "শ্লোকঃ।"৩ রাজা বললেন, "কস্য কবেঃ।" বল্লন আমাকে দেখিয়ে বললেন, "অমুষ্য কৃতিনঃ।"৫ রাজা বললেন, "তৎ পঠ্যতাম্‌"৬ বিল্লন বললেন, "পঠ্যতে।"৭ এই বলাবলিতে শার্দূলবিক্রীড়িত শ্লোকের অর্ধেকটা পূর্ণ হতেই আমি নাকি উচ্চস্বরে ব'লে উঠে সেই শ্লোক পূরণ করেছিলুম,

"কিন্তু আসাম্‌ অরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্‌চামরান্দোলনৈর্‌
উদ্বেল্লদ্‌ভুজবল্লিকঙ্কণঝণৎকারঃ ক্ষণং বার্যতাম্‌॥"

'ব্যাপারটা তা হ'লে আপনাকে খুলেই বলি।'—কালিদাস বলতে লাগলেন।

'উরগপুরের রাজা কবিতার ভক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর সভায় কোন ভালো কবিপণ্ডিতের প্রবেশ-অধিকার ছিল না। রাজপণ্ডিত বল্লন তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কোন ভালো কবিপণ্ডিতকে তিনি পারতপক্ষে

---

১ অর্থাৎ—'রাজা, আপনার উন্নতি হোক'। ২ 'হাতে তোমার কী?' ৩ 'শ্লোক।' ৪ 'কোন কবির?' ৫ 'এই কৃতী ব্যক্তির।' ৬ 'তা হলে পড়।' ৭ 'পড়া হচ্ছে।'

জার সাক্ষাতে আসতে দিতেন না। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তাঁর নিজের খাতির কমে যায়।

'বল্লনের এই অনুচিত ব্যবহারে স্বভাবতই কবি পণ্ডিতেরা ক্ষুব্ধ হন। আমি তখন সবেমাত্র উজ্জয়িনীতে এসেছি। আমার কানে একথা উঠল। বিক্রমাদিত্য আমার গুণমুগ্ধ হয়ে আমাকে তাঁর অমাত্য করে রেখেছেন, এ কারণে আমার গর্ব ছিল বাইরে খাতিরও ছিল। আমি ভাবলুম বল্লনকে জব্দ করতে হবে।

'রাজাধিরাজের কাছে ছুটি নিয়ে আমি নাম ভাঁড়িয়ে বেশ বদল করে উরগপুরে গেলুম। খোঁজ করে বল্লনের বাড়ীতে উঠলুম কাব্যকলাশিক্ষার্থী হয়ে। আমার তখন বয়স কম। দেখতেও নেহাত মন্দ ছিলুম না। পাড়াগাঁয়ে ছেলেটিকে দেখে বল্লন নিজের ঘরেই বাসা দিলে এবং কবিতা লেখার কৌশল শেখাতে লাগল। আমি বোকার ভান করেই চললুম। পাঠ আর এগোয় না। শেষে অধৈর্য হয়ে বল্লন বলে দিলেন অনুষ্টুপে হাত পাকা করবার সহজ উপায়,—আট অক্ষরের পাদ, যেমন "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ" আর চার পাদে এক শ্লোক। রাজার কাছে গেলে শ্লোক পড়তে হবে এবং সে শ্লোকে সময়োচিত রাজস্তুতি থাকবে।

'আমি অনেক চেষ্টা করে এক শ্লোক খাড়া করলুম। তাতে এক পাদে অক্ষরসংখ্যা ঠিক হল একপাদে কম পড়ল, এক পাদে অক্ষর বাড়তি হল, শেষপাদের জন্যে আর বক্তব্য অবশিষ্ট রইল না। আমি খাস কবিতাটি বল্লনকে দেখালুম,

'প্রাতর্ উত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয়স্ব।
নগরে ভাষতে কুক্কুটঃ—।

'শ্লোকটি পড়ে বল্লন বললেন, "হয়েছে মন্দ নয়! তৃতীয় পাদের অতিরিক্ত অক্ষরটি দ্বিতীয় পাদের শেষে চালান করলেই পাদ দুটি ঠিক

১ 'কিন্তু এই পদ্মনয়নাদের ঘনঘন চামরদোলানোয় লীলায়িত ভুজলতার কঙ্কন ঝঙ্কার ক্ষণেকের জন্যে বন্ধ করা হোক।

হয়ে যাচ্ছে। আর চতুর্থ উনপাদের জন্যে ভাবনা কী? চতুনু বা বৈ হি—এসব পাদপূরক অব্যয় রয়েছে কী জন্যে?"

'অনতিবিলম্বে শ্লোকটি সম্পূর্ণ করে এনে বল্লনকে দেখালুম। বললেন, "বেশ হয়েছে। পড়তো।"

'আমি পড়লুম,

"প্রাতর্ উত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
নগরে ভাষতে কুক্কু চবৈ তুহি চবৈ তুহি॥

'রাজপণ্ডিত মুখের হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে রইলেন। বললেন, "কাল তোমাকে রাজসভায় নিয়ে যাব।"

'আগে আগে রাজপণ্ডিত পিছনে আমি শ্লোকলেখা পাতড়া হাতে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলুম। রাজাকে অভিবাদন করে দুজনেই বসলুম। আমাকে দেখে রাজমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কে?" বল্লন বললেন, "কবিযশঃপ্রার্থী নবাগত।" রাজমন্ত্রী কবিতা পড়তে বললেন। বল্লন আমার হাত থেকে পাতড়াটি নিয়ে নিজেই পড়ে দিলেন শ্লোকটি। শুনে রাজা বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন, রাজমন্ত্রীর মুখ তামাটে হয়ে গেল। সভায় চাপা টিট্‌কারি বিচ্ছুরিত হল।

'আমি উঠে হাতজোড় করে বললুম, "শ্লোকটি ভুল পড়া হয়েছে। ঠিক পাঠ এই বললুম,

"প্রাতর্, উত্থায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয়স্ব ঝট্।
নগরে ভাষ্যতে কুক্কুট্ চ্যবস্বিতি চ্যবস্বিতি॥"

'মানে—শুধু প্রভাত হয়েছে। দেবপাদের পোষা শুক যেন তাঁকে জাগরিত করছে।—মহারাজ প্রভাত হল শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য করুন। পাড়ায় পাড়ায় মোরগের ডাক উঠেছে, 'গা তোলা হোক, গা তোলা হোক।' আমি "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী," আমার অজ্ঞান-ত্রুটি আপনাদের মতো মহতের ক্ষন্তব্য।"

'নতুন স্বাদের কবিতা শুনে সভার আবহাওয়া বদলে গেল। রাজার মুখ প্রসন্ন হল, মন্ত্রী ন'ড়ে বসলেন। রাজা আমাকে প্রচুর সমাদর করলেন। নিজের কাছে রাখতে চাইলেন। বাড়ীতে কাজ আছে তা সেরে নিয়ে আসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন রকমে নিস্তার পেলুম। আমার কার্য সিদ্ধ হল। বল্লন্ কাশীবাসী হলেন।'

কালিদাসের কাহিনী শুনে কুমারলাত বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য এবং বিচিত্র আপনার প্রতিভা। আমার মামলাও ওই রকম, তবে দু এক ডিগ্রি চড়া। কর্ণাটের রাজসভায় কবিপণ্ডিতের প্রবেশ নিরর্গল। তবে নবাগত কেউ যদি নিজের কবিত্বশক্তি জাহির করতে চান সে অন্য কথা। রাজার দুদিকে বাঘভালুকের মতো দুজন পণ্ডিত বসে থাকেন। তাঁরা অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাঁদের একজনের শ্রুতি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, আর একজন কানে বেশি শোনেন না তবে ঠোঁট নড়া দেখে ঠিকঠিক বুঝে নেন। কোন অতিথি কবি তাঁর নূতন রচনা পড়লে পর এঁরা তা পুনরাবৃত্তি করে জানিয়ে দেন অথবা গ্রন্থশালা থেকে পুথি এনে দেখিয়ে দেন যে কবিতাটি নূতন নয়, তাঁদের জানা। তখন কবির অবস্থাটা কী হয় বুঝুন। এই রকম চলছে মাসের পর মাস দিনের পর দিন। এ অপমান তো ব্যক্তিবিশেষের নয়, এ দেশের অখণ্ড-মনীষার অবমান আমার বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষের অপমান আপনার ভগবতী বীণাপাণির লাঞ্ছনা। এই নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিকার আপনার দ্বারাই সম্ভব। আপনি উদ্যোগ করুন। এই অনুরোধ করবার জন্যেই আমি এই বয়সে তক্ষশিলা থেকে উজ্জয়িনীতে এসেছি।'

কালিদাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এ অপমান আমার অপমান আপনার অপমান, মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান। আপনার এ অনুরোধ আমি আদেশ বলে শিরোধার্য করলুম। প্রার্থনা করুন আশীর্বাদ করুন যাতে আমি সিদ্ধকাম হতে পারি।'

'কল্যাণম্ অস্তু নিখিলসত্ত্বরাশের্ অনুত্তরজ্ঞানসুখলাভায়।'

'নমস্ তে কল্যাণমিত্রায়।'

কুমারলাত বিদায় নিলেন প্রসন্নমুখে।

বাজার কাছে এসে কালিদাস বললেন, 'আমি কিছুদিনের জন্যে ছুটি চাই।'

'কতদিনের ছুটি?'

'এই ধরুন মাস ছয়েকের।'

'এতদিন। কেন? তীর্থ-পর্যটন? সস্ত্রীক?'

'আজ্ঞে না। তীর্থযাত্রা নয়। একলাই যাব।'

'ব্যাপার কী? খুলে বলুন।'

কালিদাস ব্যাপার কী তা খুলে বললেন।

'তা হলে বলুন মামলা করতে যাচ্ছেন?'

'একরকম তাইই।'

'অগ্নি শর্মা কি বেতাল ভট্ট কাউকে সঙ্গে চাই?'

'না। প্রথমত দরকার হবে না। দ্বিতীয়ত আপনার অসুবিধা হতে পারে।'

'আমার অসুবিধার কথা ভাববেন না। দরকার হলে একজনকে নিয়ে যান। আমার কাছে একজন থাকলেই হবে।'

'বেশ। তা হলে অগ্নি শর্মাকে সঙ্গে নেব। তাকে দিয়ে আমার সব কাজই চলবে।'

'জিনিষপত্র যানবাহন যা আবশ্যক মহামন্ত্রীকে জানালেই তিনি আয়োজন করে দেবেন।'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'তাড়াতাড়ি ফিরবেন। দেখবেন যেন দক্ষিণমেঘ লিখতে না হয়।'

হাসতে হাসতে কালিদাস বিদায় নিলেন।

যোগাড়যন্ত্র করতে দু চার দিন দেরি হল। শীতের আরম্ভ, সুতরাং যে কোন দিন বেরিয়ে পড়া চলে। পত্নীকে সাবধানে থাকতে বলে আর শীঘ্র ফেরবার আশ্বাস দিয়ে কালিদাস রওনা হলেন হাতির পিঠে চড়ে অগ্নি শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে।

রাজ্যের সীমান্ত ঘাঁটিতে পৌঁছতে মাসখানেক লাগল। সেখানে হাতি ছেড়ে দিয়ে একদল ক্রয়ার্থী বণিক-সার্থের সঙ্গে জুটে গেলেন। তাঁরাও কর্ণাটনগরী যাবেন। সব ব্যবস্থা করে দিলেন মহাসামন্তাধিপতি সীমান্তপাল।

কখনো পদব্রজে কখনো শকটে বসে কালিদাস দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে চলেছেন। মনের ভাণ্ডারে রঘুর দিগবিজয়ের দেশ-পরিচিতি সম্ভার জমে উঠছিল। নিরুদ্বিগ্ন যাত্রাপথ শেষ হল প্রায় মাস দেড়েক পরে। বণিক-সার্থের সঙ্গে কালিদাস আশ্রয় নিলেন কর্ণাটনগরীর বণিক-নিবাসে। পথে যেমন পথের প্রান্তেও তেমনি অগ্নি শর্মা বাঁধেন বাড়েন, কালিদাস খান আগ্নি শর্মাকে দেন।

সহরের ও রাজবাড়ীর হালচাল বুঝে নিয়ে কালিদাস অগ্নিকে একদিন বললেন রাজসভায় গিয়ে সেখানকার কাণ্ডকারখানা জেনে এসে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।

চটকদার বেশ ভূষা করে অগ্নি শর্মা রাজসভাদ্বারে হাজির হলে তাঁকে বিদেশী ব্রাহ্মণ পর্যটক দেখে প্রহরী সসম্ভ্রমে সভায় প্রবেশ করিয়ে বসবার স্থান দেখিয়ে দিলে। অগ্নি শর্মা সেই দিকে গিয়ে ঠেলা-ঠেলি করে প্রথম সারিতে বসে পড়ল: তার আকার ইঙ্গিত দেখে কেউ আপত্তি করতে সাহস দেখালে না।

সভাভঙ্গ হলে পর অগ্নি শর্মা ফিরে এসে কালিদাসকে রিপোর্ট দিলে। সেদিন কিছুই ঘটেনি জেনে কালিদাস তাকে প্রত্যহ রাজসভায় হাজির হতে বললেন—যত দিন না কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

দশ বারো দিন রাজসভায় হাজিরা দেওয়ার পর একদিন অগ্নি শর্মা রিপোর্ট করলে যে সেদিন একজন নবাগত কবিকে অপদস্থ করা

হয়েছে। কালিদাস খুঁটিয়ে বিবরণ চাইলে অগ্নি শর্মা এই বিবরণ দিলে, নবাগত কবি রাজাকে নমস্কার করে আত্মপরিচয় দিলে পর রাজা তাঁকে স্বরচিত কবিতা—অন্তত একটি শ্লোক—পড়তে বললেন। কবি দাঁড়িয়ে উঠে হাতে পাতড়া নিয়ে একটি শ্লোক পড়লেন ধীরে ধীরে। রাজা তাঁকে বসতে বলে মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করলেন। মন্ত্রী রাজার ডাইনে বসেছিল। রাজার বাঁয়ে বসেছিল উজ্জ্বল ধুতি চাদর-পরা ললাটে ফোঁটা-কাটা এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মন্ত্রীর ডাইনে বসেছিল এক মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক বসন পরিহিত দণ্ডকমণ্ডলুধারী এক মাঝবয়সী সন্ন্যাসী। মন্ত্রী সেই সন্ন্যাসীকে ফিস ফিস করে কিছু বললেন। সন্ন্যাসী অমনি বলে উঠলেন, 'এ কবিতা আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।' অমনি রাজার বাঁ পাশের ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' এই শুনে সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে সেই শ্লোক-টির প্রথম পাদ পড়ে গেলেন। সভার সকলে হেসে উঠল। রাজার পিছনে তিরস্করিণীর অন্তরাল থেকে কঙ্কণঝঙ্কৃত মৃদু হাততালির শব্দ শোনা গেল। নবাগত কবি মুখ শুকিয়ে বসে রইলেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, 'অনেকদূর থেকে বেচারা কষ্ট করে অনেক আশা নিয়ে এসেছে ওকে তিনদিনের খাইখরচ আর যাতায়াতের রাহাখরচ হিসাবে কিছু টাকা দেওয়া হোক।' তারপর সভাভঙ্গ হল। মন্ত্রী কবিকে নিয়ে কোষাগারের দিকে গেলেন। অগ্নি শর্মাও চলে এল।

শুনে কালিদাস বললেন, 'এখুনি এক কাজ করো। কবিটি কোথায় বাসা নিয়েছে তার সন্ধান করে তাকে বলে এসো, "আমার কর্তা বিদেশী লোক, প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। আজ রাজসভায় আপনার লাঞ্ছনায় অত্যন্ত ব্যথা বোধ করেছেন। তিনি চেষ্টা করবেন আপনার সহায়তায় এর প্রতিকার করতে। আপনাকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁকে না জানিয়ে আপনি কর্ণাটনগরী ছেড়ে যাবেন না। দিন সাতেকের বেশি আপনাকে আটকে রাখবেন না। আর

আপনার প্রয়োজনের জন্য পাঁচ দীনার আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এ আপনার মর্যাদা। কাউকে কিছু বলবেন না। আমাদের পরিচয় জানতে এখন চেষ্টা করবেন না। কার্যসিদ্ধি হলে আমাদের পরিচয় পাবেন।"

অগ্নি শর্মা রাজভাণ্ডারে গিয়ে কবির ঠিকানা জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। দৌত্য কাজ সফলকরে ফিরে আসতে তার দেরি হল না।

পূর্বোক্ত কবিপরাভবের চতুর্থ দিনে কালিদাস রাজসভায় হাজির হলেন কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে। তিনি এমন ভোল পাল্‌টিয়েছেন অগ্নি শর্মার সাহায্যে যে পত্নী ইন্দুমতীও সাহসা তাঁকে চিনতে পারতেন না। মাথা চারদিক মুড়ানো কেবল মাঝখানে দীর্ঘ কেশগুচ্ছ। কেশগুচ্ছের প্রান্তে ওড্র পুষ্পের গ্রন্থি। ললাটে তিন দীর্ঘ রেখা টানা ভ্রূর সমান্তরালে, ও উপরে গোরোচনার চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র তলায় রক্তচন্দনের টিপ। গলায় বিষ্ণুচক্র তমতি। পরিধানে পীতবাস, ওড়নি নীলপট্ট। পায়ে কাষ্ঠপাদুকা। একহাতে বক্রশীর্ষ লৌহদণ্ড, অপর হাতে চন্দনকাষ্ঠের সরু পাটার মধ্যে ক্ষীণকায় পুথি।

রাজসভায় প্রবেশ করে আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর পুরোভাগে উপবেশন করলেন, "সিদ্ধিঃ সাধো সতাম্ অস্তু"— এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করে। তাঁর রকম সকম দেখে সভার সকল লোক ত্রস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বসল।

মন্ত্রী বললেন, 'কে আপনি? কি চান?'

আগন্তুক বললেন, 'আমি একজন মানুষ। নতুন কবিতা শোনাতে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'বেশ তো। একটু নমুনা পড়ুন।'

আগন্তুক পাটা খুলে পুথির একটি পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মেঘ-মন্দ্রস্বরে ধীরে ধীরে পড়লেন,

'বাগর্থাব্ ইব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥'

সহজ সরল কবিতাটি শুনে রাজার ও মন্ত্রীর পার্শ্বোপবিষ্ট পণ্ডিত দুজনের মুখ প্রসন্ন হল। সভার লোকে প্রত্যাশিত চমকদার শ্লোক না পেয়ে নিরুৎসাহ ভাব দেখালে। মন্ত্রীর ইঙ্গিত পেয়ে তাঁর পাশের পণ্ডিতও বললে, 'শ্লোকটি জানা জানা মনে হচ্ছে।' রাজার পাশের পণ্ডিত উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে, আগে কোথায় যেন পড়েছি।'

আগন্তুক বললেন, 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ—এ চারটি পদ পৃথকভাবে অথবা একত্র আপনাদের কেন অনেকেরই জানা থাকতে পারে কিন্তু শ্লোকের প্রথমার্ধটি কিছুতেই নয়। এ শ্লোক আমার রচনা, টাটকা লেখা।'

রাজার পাশের পণ্ডিত বললেন, 'প্রমাণ দেখাব।'

আগন্তুক বললেন, 'দেখান। বসে রইলুম।'

'দেরি হতে পারে।'

'তা হোক। এই সভাতেই হেস্তনেস্ত করতে হবে।'

পণ্ডিত দুজনই তখন উঠে চলে গেল গ্রন্থাগার থেকে প্রমাণপত্র আনতে।

আগন্তুকের উপস্থিতি যেন সভাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। প্রায় চার পাঁচ দণ্ড কেটে গেল কারো যেন হুঁস নেই। সকলের চোখই আগন্তুকের দিকে ফেরানো। আগন্তুকের দৃষ্টি কিন্তু মুক্ত। সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি।

পণ্ডিত দুজন যখন প্রবেশ করলেন তখন তাঁদের দেখে যেন সভার মোহাবেশ কেটে গেল। সকলে নড়ে চড়ে বসল।

রাজার পাশের পণ্ডিতের হাতে একটি পাতড়া। পণ্ডিত বললে, 'শ্লোকটি এই পাতড়াতে পেয়েছি। অন্তত দেড়শ বছর আগেকার লেখা।'

রাজা বললেন, 'তারিখ আছে তো?'

'না তারিখ নেই। চিঠি ও দলিলপত্র ছাড়া তারিখ দেওয়ার রীতি এখনও নেই তখনও ছিল না।'

আগন্তুক বললেন, 'কই দেখি আপনার পাতড়া।'

পাতড়াটি নিয়ে কালিদাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, নাকের কাছে তুলে শুঁকলেন। তারপর বললেন, 'এই তো তারিখ জ্বলজ্বল করছে, আজকের তারিখ।'

পণ্ডিত দুজন চমকে উঠে বললে, 'সে কি। কই তারিখ?'

'তারিখ চোখে দেখা যাবে না, নাকে টের পাবেন। ঝিয়ানি কালিতে লেখা হয়েছে শ্লোকটি, আজকে এখনই। ঝিয়ানি কালির পচাপচা গন্ধ এখনও উবে যায়নি। দেড়শ বছর কেন, পাঁচ সাত দিনেই এ গন্ধ উবে যায়। এখন বর্ষা ঋতু নয় তো।

রাজা কৌতূহলী হয়ে পাতড়াটি নিলেন। শুঁকে মুখবিকৃতি করলেন। কারো মুখে বাক্যস্ফূর্তি হল না।

আগন্তুক বললেন, 'মহারাজ আপনার এই ধূর্ত পণ্ডিত দুটি অনেক কবিপণ্ডিতকে অযথা লাঞ্ছনা দিয়ে আপনার সভা দূষিত এবং আপনার নাম কলঙ্কিত করেছে। এর প্রতিকার এখনি করুন ধূর্ত ব্যক্তি দুটিকে সভা থেকে দূর করে দিয়ে।' এই বলে আগন্তুক গমনোদ্যত হলে রাজা বললেন, 'থামুন থামুন, আপনার পরিচয় দিন। আপনি এ কী ইন্দ্রজাল খেলা দেখালেন।'

আগন্তুক বললেন, 'আমি ইন্দ্রজাল দেখাইনি, ওরাই এতদিন জালিয়াতি খেল দেখাচ্ছিল। আর আমার পরিচয় বিশেষ কিছু দেবার মতো নয়। আমার নাম কালিদাস। নিবাস বিশালা উজ্জয়িনী। নমস্কার।' এই বলে কপালে জোড়হাত তুলে কালিদাস কোনো দিকে না চেয়ে হন্‌হন্‌ করে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাসায় পা দিয়েই কালিদাস অগ্নি শর্মাকে হুকুম দিলেন একটা নাপিত ডেকে দিয়ে সেই নবীন কবির বাসায় গিয়ে তাঁকে তখুনি চাটি-বাটি তুলে তাঁর কাছে চলে আসতে বলতে।

নাপিত এল। কালিদাস শিখাগুচ্ছ মুড়িয়ে ফেললেন।

অগ্নি শর্মা এল। পিছু পিছু নবীন কবি।

কালিদাস বললেন কবিকে, 'ভীমরুলের চাক ভেঙে দিয়েছি। মধুপের এখানে আর একদণ্ডও তিষ্ঠানো নিরাপদ নয়। আজ সন্ধ্যার পর আমরা বেরিয়ে পড়ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। যখন যেখানে সুবিধা মনে করবে তখনি সেখানে নিজের দেশের পথ ধরো।'

কবি রাজি হল।

কালিদাস আগে থেকেই জানতেন যে সেদিন এক বিক্রয়ার্থী বণিক্-সার্থ উজ্জয়িনীর দিকে যাবে। তিনি তাদের সঙ্গে নিজেদের যাবারও বন্দোবস্ত করেছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতেই তাঁরা কর্ণাট-রাজধানী থেকে নির্গত হলেন। কালিদাসের চিন্তা দূর হল।

রাজ্যসীমান্তে পাঁছে কালিদাসেরা সার্থসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে হাতিতে চড়লেন। ঘরমুখো হাতি রাতের বেলায় দ্রুতবেগ হল। কর্ণাটনগরী ছাড়বার দুমাসের মধ্যেই উজ্জয়িনী পাওয়া গেল।

সদর দরজায় অগ্নি শর্মাকে বিদায় দিয়ে কালিদাস নবীন কবিকে নিয়ে বাড়ী ঢুকলেন। দাসের উপর নবীন কবির অভ্যর্থনা-পরিচর্যার ভার দিয়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ইন্দুমতী ছুটে এসে দেখে অবাক। বললেন, 'চুলগুলো গেল কোন্ চুলোয়?'

কালিদাস বললেন, 'বেচেছি, তবে খুব চড়া দামে। পরে সব শুনবে। একজন অতিথি এসেছেন তাঁর বন্দোবস্ত কর।'

সকালে কালিদাস রাজবাড়িতে গিয়ে বিক্রমাদিত্যকে মামলা-জয়ের বার্তা দিলেন। রাজা খুসি হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

সব কথা জানিয়ে কালিদাস কুমারলতাকে চিঠি লিখলেন। সে চিঠি অবিলম্বে তক্ষশিলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন মহামন্ত্রী॥

ভুতের বাতাস

জরুরি তলব এসেছে মহামন্ত্রীর উপকারিকা থেকে। লোক এসেছে চিঠি নিয়ে পালকি সঙ্গে করে। চিঠিতে যা লেখা আছে তার মর্ম হল বিশেষ প্রয়োজন কালিদাসকে অবিলম্বে মহামন্ত্রীর ভবনে যেতে হবে। যদি মহাকবি যেতে না পারেন তবে মহামন্ত্রীই তাঁর কাছে আসবেন।

আষাঢ়ান্ত দিনেব পড়ন্ত বেলায় রোদের ঝাঁজ কমেছে তবে হাওয়া এখনও উত্তপ্ত আছে। দ্বিরুক্তি না করে কালিদাস নরযানে সোয়ারি হলেন।

মহামন্ত্রীর ভবনে গিয়ে দেখলেন সব চুপচাপ। ভিতরের একটি কক্ষে মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ মিলল। তাঁর কাছে বসে আছেন তাঁরই বয়সী এক সৌম্যকান্ত প্রবীণ পুরুষ। কালিদাসকে দেখে দুজনেই আসন ছেড়ে উঠে সৌজন্য দেখালেন। কালিদাস অঞ্জলি-প্রণাম করলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলেন। সবাই নীরবে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মহামন্ত্রী শারদানন্দ।

'কবি, তোমার সঙ্গে এঁর পরিচয় নেই। ইনি দক্ষিণপূর্ব অপরান্ত প্রান্তের মহাসামন্তাধিপতি ভাগভদ্রেরও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কন্যা রাণী বন্ধুভদ্রার মহামন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিত। ইনি আমার সতীর্থ, বাল্যসুহৃৎ। অনেক দিন পরে দেখা হল। তবে এসেছেন ইনি আমার সঙ্গে নয় তোমার সঙ্গেই দেখা করবার উদ্দেশ্যে।'

ক্ষেমরক্ষিতের মুখে চোখ রেখে হাত জোড় করে কালিদাস বললেন, 'বলুন আপনার অভিপ্রায়।'

ক্ষেমরক্ষিত বললেন, 'বড় দারুণ এবং গোপনীয় কথা। আপনাকে

মন দিয়ে শুনতে হবে।'

কালিদাস একটু হেসে বললেন, 'মন দিতে সদাই প্রস্তুত, প্রাণ দিতে নই। বলুন 'কি বলবেন।'

শাবদানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ক্ষেমরক্ষিত তাঁকে নিষেধ করে বললেন, তোমারও শোনা দরকার। মহাকবির কল্পনার সঙ্গে মহামন্ত্রীর মন্ত্রণার সংযোগ ঘটলে আমার সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হতে পারে।'

'ব্যাপার কী', কালিদাস বললেন।

'ব্যাপার গুরুতর এবং কঠিন। ভাগভদ্রদেবের মৃত্যুর কয়েকবছর আগে একটি অজ্ঞাতকুলশীল কিশোরকে নিজের পার্শ্বচর করেছিলেন। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, বিনয়ী, সুশীল, লিখতে পড়তে ভালোই জানে। সর্বোপরি বিচক্ষণ। তিরোধানের কিছু আগে রাজা ছেলেটিকে জামাই করেন। ছেলেটির আগে কী নাম ছিল জানি না, ভাগভদ্রদেব তাঁকে গুহগুপ্ত ব'লে ডাকতেন। এই নামেই সে এখন রাজকন্যার হয়ে কাজকর্ম চালাচ্ছে।'

'রাজকর্মে তার কিছু গাফিলতা দেখছেন?'

'কিছুমাত্র না। আমার সাধারণ তত্ত্বাবধানে সব কাজ আগেকার বুড়ো রাজার দিনের মতোই স্বচ্ছন্দে চলছে।'

'তবে?'

'বিবাহসূত্রে রাজ-অধিকার পাবার কিছু কাল পরের থেকে গুহ-গুপ্তর আচরণে মাঝে মাঝে অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য ঘটছে।'

'সে কী রকম?'

'কোন ঠিক ঠিকানা নেই, মাঝে মাঝে ঘুমুতে ঘুমুতে জামাতা বাবাজী হঠাৎ জেগে উঠে রাজকন্যা-পত্নীর পিঠে দুহাত মুঠো করে কিল মারতে থাকেন আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করেন। রাজকন্যার চীৎকারে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন লজ্জিত হয়ে পত্নীর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে অনিয়মিত হলেও বারবার

ঘটছে। বাধ্য হয়ে রাজকন্যাকে স্বতন্ত্র শয়নকক্ষ আশ্রয় করতে হয়েছে। তাতে লোক জানাজানি হবার আশঙ্কা বেড়ে গেছে।'

'প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন নি?'

'রাজকন্যা চিকিৎসার অথবা ঝাড়ফুঁকের কথা উত্থাপন করলে গুহগুপ্ত বলে, "তুমি যদি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কাউকে বল তবে আমি জলে ঝাঁপ দেব।" আসল কথা কি, মেয়ে জামাইকে অত্যন্ত ভালোবাসে। জামাইও মেয়েকে ছেড়ে থাকতে চায় না।

'রাজ্যের ভার নিয়ে বসে আছি। এ ভার আমাকে দিন দিন পিষে ফেলছে। কিছু করবার হদিস পাচ্ছি না। সেদিন হঠাৎ কেন জানি না আপনার কথা মনে হল। সরস্বতী আপনার হৃদয়ে ও কণ্ঠে। আপনি হয়ত উপায় বলে দিতে পারবেন। এই রকম ভেবেচিন্তে আপনাদের কাছে এসেছি। যা হয় একটা উপায় করে দিতে হবে।'

'ছেলেটিকে যিনি দিয়েছিলেন তাঁর খোঁজ খবর করেছিলেন?'

'দিয়েছিলেন এক বড় সাধু। বিদর্ভের এক বিখ্যাত শৈবমঠের আচার্য। তিনি কোন কোন বছর আমাদের-দেবকুল সংলগ্ন অতিথি-শালায় চাতুর্মাস্য করতেন। সেই রকম এক চাতুর্মাস্যে ছেলেটিকে সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। খোঁজ অবশ্য নিতে পারতুম। কিন্তু জানাজানির ভয়ে আমাদের হাত পা মুখ বন্ধ। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। একটা বিহিত করে দিতেই হবে।'

কালিদাস চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, আপনাদের কন্যারানীর সঙ্গে আমার কিছু কথা হতে পারলে তবেই আমি বুঝতে পারতুম আমি এ বিষয়ে কিছু করতে পারব কি না। সেটা কি সম্ভব হবে?'

'সম্ভব করতেই হবে। কন্যারানীকে তো আনা যাবে না। আপনি কবে যেতে পারবেন বলুন। আমি আজ ভোরেই রওনা হচ্ছি। ষোল সাঙ্গের নরযান হলে পাঁচ দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। পথের সব ব্যবস্থা আমরা দুজনে করে দেব।'

'বেশ আমি তা হলে দশদিন বাদে যাত্রা করব। কাউকে কিছু বলবেন না। আমি আপনার বাড়ীতে গিয়ে উঠব অতিথি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়ে। তারপর যা করতে হবে আমি সেখানে গিয়ে বাত্‌লে দেব।'

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে কালিদাস বিদায় নিলেন।

সেদিনের কথাবার্তার ঠিক পক্ষকাল পরে সন্ধ্যার ঝোঁকে কালিদাস এসে পৌঁছলেন ভাগভদ্রের রাজধানী ভদ্রাবতীতে। সোজা উঠলেন গিয়ে মন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিতের আবাসে। মনুষ্যবাহ্য যান কালিদাস পছন্দ করতেন না দুটি কারণে। প্রথমত পশুবৎ বাহনগিরিতে মানুষের নিয়োগ তিনি পাপতুল্য অপরাধ বলে মনে করতেন। দ্বিতীয়ত এ যানে গমনাগমন মেয়েদেরই শোভা পায়। তাঁরা তো একরকম নরবহনই। অন্য কোন উপায়ে এত তাড়াতাড়ি আসা যেত না বলেই কালিদাস পাল্‌কি আশ্রয় করেছিলেন। পথে কোন অসুবিধা হয় নি। বেশ শুয়ে শুয়ে বসে বসে দেখতে দেখতে এসেছেন। এসে ভালোই লাগছে। ছোট নদীর তীরে ঘেরা বাগানের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয়ের আবাস। কয়েক বছর পরে উজ্জয়িনী থেকে দূরে এসে কালিদাসের মন যেন নবীন হয়ে উঠল। সকালে ক্ষেমরক্ষিত একঘটি জিরান কাঠের খেজুররস এনে দিলে। তা পান করে মহাকবির মনে হল তিনি যেন ছেলেবেলার দিনে জেগে উঠেছেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর কালিদাস বললেন, 'কন্যারানীর সঙ্গে এবার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন।'

ক্ষেমরক্ষিত বললেন, 'আপনার তো রাজবাড়ীতে যাওয়া চলবে না। কোন অছিলায় তাঁকে আমার এখানে আনতে হবে। আপনার পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না। তাইত, কি করা যায়।'

'আপনি বাড়ীর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে আসুন। ওঁরা ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'তাই বাড়ীর মধ্যেই যাই।'

দণ্ডখানেক পরে মন্ত্রী মহাশয় বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে এসে বসে বললেন, 'ওঁরা বলছেন, কাল বাদ পরশু উত্থান-একাদশী। আপনার আগমন উপলক্ষ্য করে ও-দিন একটু ভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কন্যারানীকে আমন্ত্রণ করলে ওঁর এখানে আসা সহজ হবে। রাজ-বাড়ীতে এখন এ সব অনুষ্ঠান আর হয় না। তবে বন্ধুভদ্রা এ সব ভালোবাসেন।'

'সে কথা মন্দ নয়। তবে আমার পরিচয় যেন বাইরে ফাঁস না হয়। এমন কি আমি যে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী থেকে আসছি এ সন্দেহও কারো মনে যেন প্রশ্রয় না পায়।'

'না-না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

উত্থান-একাদশী পর্বের ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষ্যে কন্যারানী বন্ধুভদ্রা এসেছেন মন্ত্রী মহাশয়ের ভবনে একটি বিশ্বস্ত চেড়ীকে সঙ্গে নিয়ে।

রন্ধন-মহলে তখন মেয়েরা ভিড় করেছে আর চেড়ী তখন আনাজ কুটতে নিযুক্ত। এমন সময় ক্ষেমরক্ষিত অন্যের অলক্ষিতে, কালিদাস যে ঘরে বসেছিলেন কন্যারানীকে সেই ঘরে নিয়ে এলেন। পরিচয় করে দিলে কন্যারানী আনন্দবিস্ময়ে উদ্ভাসিত হয়ে কালিদাসকে প্রণাম করতে গেলে কালিদাস তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'ওই হয়েছে। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার মনের কালি মুছে যাক। বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

শুনেই ক্ষেমরক্ষিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতে কালিদাস তাঁকে নিষেধ করলেন, 'যাবেন না। থাকুন।'

তারপর কন্যারানীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার কষ্টের কথা শুনে প্রতিকার-চেষ্টায় এসেছি। কোন আশঙ্কা না করে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। তোমার উত্তরের উপর প্রতিকার ব্যবস্থা নির্ভর করছে।'

'বলুন। আপনাদের দুজনের কাছে আমার গোপন করবার কিছু নেই।'

'কতদিন জামাই বাবাজীর স্বপ্নাভিযান শুরু হয়েছে ?'

'প্রায় মাস আষ্টেক হল।'

'কদিন অন্তর অন্তর হয়।

'ঠিক নেই। তবে মাসে তিন চার বার তো বটেই।'

'প্রথম যে রাত্রে আরম্ভ হয় সে দিনে বাবাজী কোন বিশেষ কিছু খাদ্য খেয়েছিলেন ? বা কোথাও গিয়েছিলেন কি ?'

'বিশেষ কিছু খাদ্য পানীয় বা ওষুধ খান নি বলেই মনে হয়। তবে বিকাল বেলায় পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ', বলে কালিদাস চুপ করে রইলেন।

'আচ্ছা, বল তো প্রথম দিনের আঘাত কি রকমের বা কি ভাবের ছিল—অর্থাৎ চড়চাপড় না কিলঘুঁসি না আঁচড়কামড় ?'

'দুহাতের জোড়া-কিলের আছাড় চলেছে তো চলেইছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমি হতচকিত ও জর্জরিত। আমার চীৎকারে ওঁর হুঁস হল। অমনি বালিসে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুতেই আর সাড়া দিলেন না। যতবার ঘটেছে ঠিক এই রকমই। প্রতিকারের কথা তুলতে গেলে আত্মঘাতী হতে চান। কিন্তু প্রতিকার না হলে আমি বাঁচি কি করে।'

'প্রহারের সময়ে কোন রকম শব্দ করেন কি ?'

'হাঁ। আর কিছু নয় শুধু ফোঁস ফোঁস বা হুঁস হুঁস শব্দ। যতক্ষণ কিল-আছাড় চলতে থাকে।'

শুনেই কালিদাস দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, 'অনেক দুঃখ পেয়েছ। আর বোধ হয় পেতে হবে না। এস তুমি। মনকে চাঙ্গা কর। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

বন্ধুভদ্রা বিনত হয়ে কালিদাসের পদস্পর্শ করলে। কালিদাস তাঁর

মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'এস।'

ক্ষেমরক্ষিতের সঙ্গে কন্যারানী ভিতর মহলে চলে গেলেন।

ক্ষেমরক্ষিত ফিরে এলে কালিদাস বললেন, 'কতদিন আগে আপনার কর্তা ভাবী জামাই বাবাজীকে পেয়েছিলেন?'

'দশ বারো বছর হবে। ঠিক তারিখ চাই কি?'

'না। কার কাছে পেয়েছিলেন?'

'মহারুদ্র মঠের আচার্য বটেশ্বর স্বামীর কাছ থেকে। সেবার উনি ভদ্রাবতীতে বর্ষাযাপন করছিলেন। ছেলেটি সঙ্গে ছিল।'

'আমাকে কালই মহারুদ্র মঠের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে হবে! আপনি সব ঠিকঠাক করে দিন।'

'বেশ।'

কয়েকদিন পরে মহারুদ্র মঠের অতিথিশালায় কালিদাস গিয়ে হাজির হলেন। আহারের পর কালিদাস মঠস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সেবক বললে, 'তিনি তো খুব বৃদ্ধ হয়েছেন এখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।'

কালিদাস বললেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁকে জানাও গিয়ে যে উজ্জয়িনী থেকে কুমারসম্ভবকার এসেছেন তাঁর দর্শনার্থী হয়ে।'

সেবক গিয়ে নিবেদন করলে, 'প্রভু উজ্জয়িনী থেকে এক ব্যক্তি এসেছেন আপনার দর্শন পেতে। তাঁর নাম কুমার সম্ভবকার।'

বৃদ্ধ বটেশ্বর স্বামী শয্যায় কাত হয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। শুনে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। বললেন, 'কুমার সম্ভবকার নয়, কুমার-সম্ভব-কার— কালিদাস। ডাক, ডাক তাঁকে এখনি।'

কালিদাস এসে ঝুঁকে প্রণাম করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পদধূলি নিয়ে মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিলেন, বটেশ্বর স্বামীর ব্যগ্র ইঙ্গিতে তাঁর বিছানার প্রান্তে বসলেন। স্বামী তাঁর দুটি হাত ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় ধীরে ধীরে বললেন,

'অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে ॥'

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে কালিদাসের বুক ঠেলে চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, 'আমার লেখনী ধারণ সার্থক হয়েছে,—আজ তা বুঝলুম।'

উজ্জয়িনীর কথা, মহাকালের কথা, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের কথা ইত্যাদি নানা কথার পর বটেশ্বর স্বামী বললেন, 'বিশেষ কি হেতু আগমন সে কথা বলুন।'

'তুচ্ছ সামান্য জ্ঞাতব্য কিছু উপলক্ষ্য করে আপনার দর্শনে নিজেকে ধন্য করতে এসেছি। আজ যখন অনায়াসে আপনার দর্শন পেয়েছি তখন তুচ্ছ জ্ঞাতব্যের কথা ভাবি না। ও এমনিই পাব।'

'না না বলুন। লজ্জা বা বিনয় করবেন না। জ্ঞান হল জিজ্ঞাসা বৃক্ষের ফল। ভালো সে ফল কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। গাছ থেকে পেড়ে নিতে হয়। জানেন তো মনু মহারাজের সাবধানবাণী—"না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ।'

'আমিও অন্যায় প্রশ্ন করব না। আচ্ছা, কখনো আপনার কোনো রজকজাতীয় বালক অনুচর ছিল?'

'একবার একটি অব্রাহ্মণ ছেলেকে কাছে রেখে কিছু শিখিয়ে-পড়িয়েছিলুম। কিন্তু তার জাত কি ছিল তা তো কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। তার নাম ছিল গজানন, আমি পালটে রেখেছিলুম ষড়ানন। চেহারা ভালো ছিল, রাজপুত্রের মতো। বুদ্ধিশুদ্ধিও খুব ধারালো ছিল। তবে সে ব্রাহ্মণ নয়, তাকে সন্ন্যাস দেওয়া যেত না। তাই তাকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াই নি। কাব্য ও নীতি শাস্ত্রে বেশ পড়াশোনা করছিল সে আমার কাছে।'

'কোথায় ওকে পেয়েছিলেন?'

'গোদাবরীর ধারে বাকাটক গ্রামে আজীবিকদের জন্যে নির্মিত প্রাচীন গুহায় একবার আমি চাতুর্মাস্য যাপন করেছিলুম। ছেলেটি

রোজ দুপুর বেলায় আমার কাছে এসে চুপ করে বসে কথা শুনত। সূর্যাস্ত হবার আগেই সে উঠে যেত। দুপুর বেলায় আর কেউ না থাকলে আমি তাকে বর্ণমালা শেখাতে প্রবৃত্ত হতুম। চার মাস শেষ হবার আগেই সে অক্ষর সব চিনে গেল। বানান করে সব পড়তে পারত, বানান করে সব লিখতেও পারত। তাই, আমার চলবার সময় হলে সে যখন ম্লান মুখ করে আমাকে বললে আমার সঙ্গে সে যাবে তখন আমি মন কঠিন করে তাকে না বলতে পারিনি। আমি জানতুম তার বাপ মা কেউ ছিল না। হয়ত তাকে সঙ্গে এনে ভুল করিনি। সে মানুষ হয়েছে, রাজসহচর। হঠাৎ তার কথা কেন?'

'না না, তার কিছু হয়নি, সে ভালোই আছে। রাজা তাকে জামাতা করেছিলেন। রাজার মৃত্যু হয়েছে। আপনার ষড়ানন এখন রাজকন্যার স্বামীও প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করছেন। ওঁদের মন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিত জামাতা-রাজার অজ্ঞাতকুলশীলত্ব ঘুচুতে চাইছেন ওর পূর্বপুরুষদের সন্ধান করে।'

'এখন বংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কী হবে? যা ঘটবার তাতো ঘটেই গেছে। এখন আপনার হাত। যদি আর একটি 'বংশ' বা 'সম্ভব' কাব্য লিখে দেন তবে জামাতা বাবাজীর কুলগৌরব সাত তাল ছাড়িয়ে যাবে।'

এই বলে বটেশ্বর স্বামী হাসতে লাগলেন। সে হাসিতে কালিদাসের কণ্ঠও খুলে গেল। পাশের ঘর থেকে সেবক উঁকি মারলে ব্যাপার কী দেখতে।

তারপর সাত পাঁচ কথা হল। কালিদাস প্রণাম করে বিদায় নিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বেদমন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন,

"সুগা তে সুপথা কৃণু
পূষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ।"

অতিথিশালায় রাত কাটিয়ে ভোর হতেই কালিদাস বেরিয়ে পড়লেন।

উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করে কালিদাস তখনি ডাক দিলেন বেতাল ভট্টকে।

বেতাল আসতেই তাকে বললেন, 'আজই তোমাকে এক ব্যাপারে খোঁজে বেরতে হবে।'

'বলুন।'

বিদর্ভে প্রতিষ্ঠানপুরের অনতিদূরে এক বিখ্যাত শৈবমঠ আছে মহারুদ্র নামে। সেখানকার বৃদ্ধ-আচার্য বছর দশেক আগে বাকাটক গ্রামে আজীবিকদের প্রাচীন গুহাগৃহে বর্ষা-চাতুর্মাস্য করেছিলেন। গ্রামটি গোদাবরীর সন্নিকটে, আজীবিক গুহা নদীতীরে। তুমি ওই গ্রামে গিয়ে খোঁজ নেবে কোনো একটি সুদর্শন বালক,—জাতি ব্রাহ্মণ নয়, পেশা সম্ভবত রজকের—সেই বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে বিবাগী হয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিল কি না। যদি সেখানে অথবা অন্য কোনখানে ওই রকম কোন গ্রামে, ওইভাবে বিবাগী হওয়া কোন ছেলের সন্ধান পাও তবে তার খুঁটিনাটি সব বিবরণ অবিলম্বে আমাকে এনে দেবে। এ ব্যবহারকৌশলের কাজ অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি না পারলে আমাকেই বেরুতে হবে।'

'না না। কিছু ভাববেন না। আমি পারব।'

'তবে সাবধান। কোনরকমে কারো মনে সন্দেহ যেন না হয় যে তুমি চরবৃত্তি করছ। অতি গোপনীয় ব্যাপার। মরণ-বাঁচনের সূক্ষ্ম সমস্যা।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। পক্ষ কালও লাগবে না। খবর এনে দিচ্ছি।'

'শিবাস্ তে পন্থানঃ সন্তু।'

বেলা দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে। গোদাবরী-তটস্থ গুহাবাসের দ্বারে বসে এক দীর্ঘকায় বলবান পরিব্রাজক, চেয়ে দেখছেন অনতিদূরে এক রজকের বস্ত্রধাবন কাণ্ড। কাপড় কাচা শেষ করে শুকুবার জন্যে তা মেলে দিয়ে রজক ধীরে ধীরে গুহা-গৃহের ধাপ বয়ে উঠে এল রৌদ্র

তাপ থেকে বিশ্রাম নিতে। কাপড় শুকুলেই সে তা গুটিয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে।

উঠেই পরিব্রাজককে দেখে সে বিস্মিত হল। প্রণাম করে বললে, 'এখানে কেউ রয়েছেন আমি তা বুঝতে পারিনি।'

'অনেকক্ষণ। তোমার কাপড় কাচার কৌশল দেখছিলুম।'

একটু লজ্জা পেয়ে লোকটি বললে, 'আপনার ভিক্ষা হয়েছে তো?'

'না ভিক্ষা এখনও হয় নি। তার কোন প্রয়োজনও বোধ করছি না। কাল যেখানে ছিলুম সেখানে ভিক্ষা একটু গুরুতর রকমই হয়েছিল।'

'তা কি হয়। আমাদের গ্রামে এসে সাধুবাবাজী উপবাসী থাকবেন? আপনি গ্রামের দিকে যান। এখনও সব গৃহস্থের হেঁসেলের পাট উঠে নি। উঠুন, দেরি করবেন না।'

পরিব্রাজক হেসে বললেন, 'শরীর বড় ভার ঠেকছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না। তোমার সঙ্গে কথা কইলে বোধ হয় শরীরটা ঝরঝরে হবে। আমার একটু বকমবাই আছে। কথাবার্তার মানুষ পেলে আর কিছু চাই না। আচ্ছা, তোমাদের এখানে কত কালের বাস?'

'আজ্ঞে, আমি শ্বশুরবাড়ীতে থাকি। এসেছি দশ বিশ বছর হল। আমার শ্বশুরগোষ্ঠীর বাস এখানে অনেকপুরুষের।'

'আমি আট দশ বছর আগে এখানে একবার এসে দু এক দিন কাটিয়েছিলুম। তখন দেখেছিলুম একটি সুশ্রী ছেলেকে কাপড় কাচতে। তাকে চেন? সে আছে?'

'আজ্ঞে খুব চিনতুম। গজানন আমার শ্বশুরদের জ্ঞাতি ছিল যে।'

'কী হল তার?'

'সে এক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে ঘর দুয়ার ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেছে, অনেকদিন হল।'

'কী রকম?'

'শুনবেন? তবে বলি। তার বাপ মা ছিল না। বাপ ভালো রজক ছিল। দুটি ভালো গাধা ছিল, নাম দিয়েছিল তাদের মন্দী আর

ভদ্দী। বাপ মারা যেতে সে গাধা দুটিকে পালন করত, অল্পস্বল্প কাপড় কাচার কাজ করত। কী জানি কী হল। ঘরে চাবি তালা মেরে মদ্দী-ভদ্দী তার এক জ্ঞাতি খুড়োকে দিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর চেলা বনে দেশ ছেড়ে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে। তাকে আমি দেখেছি। সকলেই তাকে পছন্দ করত। তার ভিটেতে কাঁথ এখনও খাড়া আছে তবে চালে খড় নেই। যদি কখনো ফিরে আসে এই ভেবে সে ভিটে আমরা কাউকে দখল করতে দিই নি।'

বেতাল ভট্ট অন্য কথা পাড়লেন। বেলা পড়ে এল। লোকটি বললে, 'এই বার উঠি। কাপড় চোপড়গুলো জড় করে বাড়ী যাই। আপনার জন্যে কিছু ভিক্ষা এনে দিতে হবে তো।'

পরিব্রাজক বললে, 'ব্যস্ত হয়ো না। এক দিন কিছু না খেলে আমার শরীর ভালোই থাকবে। মনে রেখো আমি ভিক্ষুক। দরকার হলে চাইতে আমার লজ্জা নেই।'

'না না, তা হবে না।' বলে সে উঠে গেল।

দণ্ড চার পাঁচ পরে সে ফিরে এল। তার এক হাতে এক ছড়া পুষ্ট পাকা কলা, আর হাতে একটি ছোট ভাঁড়, তাতে কিঞ্চিৎ গুড়।

কলাছড়া ও গুড়ের ভাঁড় নামিয়ে রেখে লোকটি বললে, 'দিন আপনার কমণ্ডলু। নদী থেকে জল এনে দিই। আপনি হাত পা ধুয়ে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন। এখনো সূর্য ডোবে নি।'

লোকটির বোধ হয় জৈন সাধুদের আচরণ জানা ছিল।

আহারের পরে সে পরিব্রাজককে বললে, 'একটু বাইরে এসে দাঁড়ান।' এই বলে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে গুহাকক্ষটির মেঝে খানিকটা সাফ করে দিলে। বললে, 'এইবার এখানে আঁচল পেতে গড়িয়ে নিতে পারেন।'

তারপর সে বিদায় নিলে প্রণাম করে। পরিব্রাজক আশীর্বাদ করলে, 'তোমার ভালো হোক।'

কাজ সফল হয়েছে। বেতালের মন এখন উজ্জয়িনীতে ফিরতে

উদ্‌গ্রীব। অথচ এখানে রাত না কাটিয়ে ফেরবার উপায় নেই। লোকটি যেমন ব্যস্তবাগীশ, হয় তো মাঝরাত্রিতে খেয়ালবশে বাবাজী কেমন আছে জানতে এসে পড়তে পারে। তখন আমাকে না দেখতে পেলে সন্দেহ করবে আমি হয়ত চোর-ছেঁচড়। রাতটা কাটানো যাক।

'খবর মিলেছে?' বেতাল ভট্টকে দেখেই কালিদাস বলে উঠলেন।

সহাস্যবদনে বেতাল ঘাড় নেড়ে জানালে খবর মিলেছে।

তার সব কথা কালিদাস মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'বেশ। তোমার ছুটি হল। বিকেলের দিকে অগ্নিশর্মাকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো।'

পাঠশালার দ্বারে অর্গল দিয়ে কালিদাস চিঠি লিখতে বসলেন।

"অপরাস্তপ্রাস্তসিংহাসনাসনা স্বাধিকারাৎ পট্টমহাদেবী শ্রীশ্রীমতী বন্ধুভদ্রা রাজশ্রীমাতার করকমলে নিবেদন—

বৎসে, রুষ্ট হইয়ো না এই সম্বোধনে। আমার ভাগ্যে সন্তানলাভ যদি ঘটিত তবে দুহিতা হইলে তোমার বয়সীই হইত। তোমাকে আমার না-হওয়া কন্যা বলিয়া ভাবিতে ভালো লাগিতেছে। বৃদ্ধকে ক্ষমা করিয়ো। তোমার রাজশ্রী চিরকাল অম্লান থাকুক, সে পদ্মের একটি পাপড়িতেও যেন হিমস্পর্শ না ঘটে।

জামাতা বাবাজীর রোগ-বিনিশ্চয় করিয়াছি। তাঁহার গায়ে প্রেতের বাতাস লাগিয়াছে। কোনো রজক-যোগিনীর ক্ষেত্রে অথবা তাহার অধিষ্ঠিত গাছের তলায় উনি কিছু অনাচার করিয়া থাকিবেন। সেই অপরাধে অপদেবতা আশ্রয় লইবার সুযোগ পাইয়াছে।

রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা দিতেছি। অব্যর্থ প্রতিকার। মনে মনে এই মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়া রাখিবে। প্রয়োজন হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে।

"স্মর বাকাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুযুঃ শুযুঃ॥"

'রোগ-লক্ষণ প্রকট হইলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কানে এই মন্ত্রটি একটি বার জপ করিবে সুস্পষ্টভাবে। তাহাতে তখনি ফল না পাইলে উচ্চৈঃস্বরে আর একবার আবৃত্তি করিবে। তখনি ভূত ছাড়িয়া যাইবে। তৃতীয়বার আবৃত্তি করিবার আবশ্যক হইবে না।

'এ মন্ত্র কাহাকেও বলিয়ো না। বলিলে ফল হইবে না।

'এই পত্র প্রিয়বয় ক্ষেমরক্ষিতকে দেখাইবে। জামাতা বাবাজীকেও দেখাইতে পার। কিন্তু আর কাহাকেও নয়। পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

'মন্ত্র প্রয়োগের ফলাফল অবশ্য অবশ্য আমাকে জানাইবে।

'তুমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কল্যাণপরম্পরা ভোগ করিতে থাকহ এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। ইতি উজ্জয়িনীতঃ শ্রীকালিদাসস্য। সংবৎসর ২৪ হেমন্তপক্ষ ৬ দিবস ৮ ॥'

পত্রটি চন্দন কাষ্ঠের পাটার মধ্যে রেখে রেশমি সুতায় বেঁধে মুদ্রাঙ্কিত হল। তার উপরে ঠিকানা লেখা হল, 'শ্রীশ্রীমতী বন্ধুভদ্রা পট্টমহাদেবী করকমলে'। সেটি আর দুটি বৃহত্তর পাটার মধ্যে বেঁধে দিয়ে সিল করা হল। এর উপরে ঠিকানা রইল, 'কুমারপাদীয় মহামন্ত্রীবর শ্রীযুক্ত ক্ষেমরক্ষিতেন প্রাপ্তব্যা দ্রষ্টব্যা চেয়ং কীলমুদ্রা'।

বিকালে অগ্নি শর্মা এলে চিঠিটি তার হাতে গচ্ছিত করে দিয়ে কালিদাস বললেন, 'এটি যত শীঘ্র পারো ভদ্রাবতীতে গিয়ে মহামন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিতের হাতে দিয়ে এস।' অগ্নি শর্মা চিঠি নিয়ে চলে গেল।

মন্ত্রবলে বলীয়সী কন্যারানী এখন সাহস করে পতির শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। রাত্রিতে ঘুমোবার আগে রোজই মনে একটু চাঞ্চল্য আসে, কি হয় কি হয়। একদিন ঘটে গেল গুহগুপ্তের রোগের প্রকাশ। বন্ধুভদ্রা প্রহার উপেক্ষা করে স্বামীর কানের কাছে অনুচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণ করে মন্ত্র পড়লে,

'স্মর বাকাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ॥'

শুনেই গুহগুপ্ত ঠাণ্ডা, একেবারে জল। এক মুহূর্তে মানুষটা বদলে গেল। বাঘ হয়ে গেল পোষমানা কুকুর। কিছু না বলে সে বালিসে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। বন্ধুভদ্রা তাকে কিছু বললে না।

পরের দিন সকালে গুহগুপ্ত পত্নীকে বললে, 'কাল রাত্রিতে যে শ্লোক শোনালে ওটি আমার খুব মনে লেগেছে। ওটি কার লেখা? কোথায় পেলে?'

'কালিদাসের লেখা। আমায় দিয়েছেন তোমার উপর ভূতের নজর লেগেছিল, তা কাটাবার জন্যে।'

জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে গুহগুপ্ত বললে, 'লোকে ঠিকই বলে। "জিহ্বাগ্রেঽস্য সরস্বতী"। আর ও কথা ভুলে যাও॥'

অভিচার

ফাল্গুনের শেষ। মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বনভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসেছেন অতীতকালের রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে। বড় বড় রাজ-পারিষদ অনেকেই এসেছেন। কালিদাসও এসেছেন। রাজা ও পারিষদদের জন্যে শিবির খাটানো হয়েছে। কালিদাস শিবিরে ওঠেন নি, উঠেছেন বাল্যবন্ধু সুনন্দনের পৈতৃক বাড়ীতে। একদা এ বাড়ীতে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। সুনন্দন এখন রাজসংসারে একজন বড় কর্মাধ্যক্ষ। সে কুমারভৃত্য অর্থাৎ রাজপরিবারের ছেলেদের দারক-আবাস তাঁরই অধীন। তাই সুনন্দনের বিদিশায় আসা প্রায়ই ঘটে না।

প্রথম যৌবনের বেশ কিছুকাল কালিদাসের কেটেছিল বিদিশায়। উদয়গিরির শিলাবেশ্মে উদ্দাম যৌবন যাপনের স্মৃতি তাঁর বুকে এখনো ঠেলা দেয়। চলোর্মি বেত্রবতীর অনেক ভ্রূভঙ্গি তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে।

সেদিন সূর্য ডুবুডুবু হয়ে এসেছে। উদ্দেশ্যহীন হয়ে বেড়াতে বেড়াতে কালিদাস ও সুনন্দন নগরসীমা ছাড়িয়ে খানিকটা চলে এসেছেন উদয়গিরিকে বাঁয়ে রেখে। তাঁদের সামনেই পড়ল এক প্রকাণ্ড চৈত্য-সৌধ অর্থাৎ অস্থি-সমাধি ও স্মারক মন্দির। কোন পুরানো রাজ-রাজড়ার হবে। উঁচু পাঁচির ঘেরা ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের উদ্যানমণ্ডপের মাঝখানে বিরাট গম্বুজওলা কারুকার্যময় অট্টালিকা। বাগান-বাড়ীটির বিশেষত্ব হল দরজা খোলাও নয় বন্ধও নয়,—বাইরে থেকে হুড়কো দেওয়া, ভিতরে খিল আছে। অর্থাৎ কারো প্রবেশে বাধা নেই যদি ভিতর থেকে খিল দেওয়া না থাকে, আর ভিতর থেকে বাইরে আসতেও বাধা নেই যদি বাইরে থেকে হুড়কো

দেওয়া না থাকে। ভিতরের খিলের তুলনায় বাইরের হুড়কো অনেক মজবুত। সেইজন্যে লোকে ইচ্ছাসুখে এ বাগানে ঢুকতো না।

কালিদাসের ভূতের ভয় ছিল না। তিনি ভূত পেত্নী ব্রহ্মদৈত্য এসবের সঙ্গে অনেক কারবার করেছেন। তা সকলেই প্রায় জানে। তবুও এখানে এসে সুনন্দন যখন বললেন, 'কি ঢুকবে নাকি? না ছেলেবেলার ভয়ের ছোপ এখনও আছে?'

কালিদাসেরও অনেককাল পরে ভিতরটা একবার দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তিনি বললেন, 'আমি তো এখন ভূতের রোজা। তোমার ভয় না হয় তো চল ঢুকি।'

হুড়কো খুলে ভিতরে ঢুকলেন তাঁরা তবে দরজায় খিল দিলেন না। আগেকার চেয়ে বাগান আরও অগোছালো হয়েছে। আগাছাও অনেক উঠেছে। মন্দিরের চারদিকের বাগান এখন ঘন বন হয়েছে। বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ীটিকে ঘিরে সরু পথ। সে পথ ঘাসে আগাছায় ঢাকা পড়েছে। তবে দুপাশের গাছঝাড় থেকে সরু নালার মতো বোঝা যাচ্ছে। ডান দিক ধরে একটু এগিয়ে গেলে মন্দিরের খোলা দরজা, কপাট নেই। একটি মাত্র বড় গোল ঘর, তার মধ্যে কোন কিছু নেই, এমন কি প্রদীপদানও নেই। চারদিকের দেওয়াল ছোট ছোট জাফরি-কাটা। গম্বুজ ছাত, খুব উঁচু। কথা কইলে কিছুক্ষণ ধরে গম্‌গম্ করে প্রতিধ্বনি হয়। শুনলে গা ছমছম করে।

হলের মধ্যে ঢুকে কালিদাস তখনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'স্থানটি মোটেই মনোরম নয়। এমন সন্ধ্যাটা এখানে নষ্ট করব। চল বেরিয়ে যাই।' সুনন্দনও থাকতে চাইলেন না। দুজনে বেরিয়ে এসে বাগান-বাড়ীর দরজায় হুড়কো টেনে দিলেন।

বেরিয়ে এসে কালিদাস উপর পানে চাইলেন। গম্বুজের কার্নিশে স্থানে স্থানে কাকেরা খড়কুটো নিয়ে বাসা বেঁধে জটলা করছে। কালিদাসের মুখে হাসি ফুটল। সুনন্দন বন্ধুর মনোভাব বুঝতে পেরে

ঠাট্টা করে বললেন, 'কী! নিজের পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছে তো?—"নীড়ারম্ভৈর্ গৃহবলিভুজাম্ আকুলগ্রামভেত্যাচৈত্যাঃ"'। কালিদাস সাড়া দিলেন না। দু বন্ধু বাড়ীর দিকে এগুলেন।

একটু পরে নজরে পড়ল, ডানদিকের রাস্তা ধরে দুজন বাগানের দরজার দিকে চলেছে। একজন বছর আট-দশের ছেলে আর একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান। তাদের লক্ষ্য করে সুনন্দনের মুখে বিস্ময়ের ভাব জাগতে দেখে কালিদাস বললেন, 'কে ওরা? চেন নাকি?'

'হুঁ', বলে সুনন্দন দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে ঢুকলেন। কালিদাসও পিছু পিছু এলেন। বললেন, 'কী হে, ব্যাপার কী?'

কালিদাসের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুনন্দন বললেন, 'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের লক্ষ্য করেছে?'

কালিদাস বললেন, 'লোকটা ছেলেটির সঙ্গে যেভাবে কথা কইতে কইতে চলেছে তাতে মনে হয় না বাইরের দিকে ওর খুব হুঁস আছে। কিন্তু ব্যাপার কী?'

'কী জানি ভাই আমার ভালো লাগছে না,' সুনন্দন বললেন। 'ছেলেটি আমার কাছের প্রতিবেশী, আমাদের বাড়ী থেকে তিনখানা বাড়ীর পর ওদের বাড়ী। সংসারে ওই ছেলেটি আর মা ছাড়া কেউ নেই। তত্ত্বাবধান করে ছেলেটির বাপের এক পিসি। পয়সা কড়ি বেশ আছে।'

'আর লোকটা কে?'

'ওদেরই কোন আত্মীয়, মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি। শুনতে পাচ্ছি বাড়ীর কর্তার মৃত্যুর পরে খুব ঘন ঘন আসছে। ও থাকে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে। পাড়ার লোকে ওর আসা যাওয়া খুব ভালো চোখে দেখছে না।'

কালিদাস বললেন, 'তাহলে তো এখানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ওরা কি করে না করে দেখতে হবে।'

দণ্ড দুই পরে জোয়ান লোকটা বেরিয়ে এসে বাগান-বাড়ীর দরজায় হুড়কো টেনে দিলে। সঙ্গে ছেলেটি নেই। বেরিয়ে সে হন হন করে যে রাস্তায় এসেছিল সে রাস্তা দিয়ে উধাও হল। কালিদাস ও সুনন্দন যেখানে ছিলেন সেখান থেকে লোকটিকে পাকড়াতে হলে দৌড়তে হত। তাঁরা তা করলেন না। দ্রুতগতিতে এসে হুড়কো খুলে বাগান-বাড়ীতে ঢুকলেন। ঢুকতেই কানে এল মন্দিরের মধ্যে থেকে ভীত বালকের করুণ কণ্ঠস্বর, 'কাকা আমাকে ফেলে কোথা গেলে গো!'

সুনন্দন এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আশ্বাস দিলেন, 'ভয় কী। এই তো আমরা এসেছি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে। আমাকে তুমি চেনো না?' ছেলেটির চোখে ভয় মুখে মৃদু হাসির রেখা, ঘাড় নেড়ে জানালে খুবই চেনে।

কালিদাসের পরামর্শ মতো সুনন্দন ছেলেটিকে নিয়ে নিজের বাড়ী এল। 'তোমার মাকে খবর দিচ্ছি যে তুমি আমাদের বাড়ীতে আছ। একটু পরে তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব,' এই বলে সুনন্দন ছেলেটিকে তার স্ত্রীর জিম্মা করে দিলে।

তাকে বাড়ী পাঠাবার আগে কালিদাস ছেলেটির সঙ্গে গল্প-স্বল্প করে তার মন ভিজিয়ে ফেললেন। তাঁর দলে ছেলের সংখ্যা একটি বাড়লো। যাবার আগে কালিদাস বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি একটা মজার খেলা খেলব। তুমি রাজি থাক তো বল।'

ছেলেটি বললে, 'খুব রাজি আছি।'

'তা হলে তুমি বাড়ী গিয়ে মাকে বা কাউকে আজকের বাগান-বাড়ীর কথা বা আমাদের মজার খেলার কথা বলবে না। তোমার কাকা বাগান-বাড়ীর কথা তুললে বলো, ও বাড়ীর সুনন্দন জেঠা বাগানে গিয়ে দেখতে পেয়ে আমাকে নিয়ে আসেন। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে বাগান-বাড়ীতে তুমি ভূত দেখেছিলে, সে ভূত তোমাকে ভয় দেখায় নি, বলেছিল অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার পর একলা এলে

আমাকে এক ঘড়া মোহর দেবে। সে মোহর ওখানেই পোঁতা আছে।

'কিন্তু সাবধান এই কথা তুমি কিছুতেই আর কাউকে বলবে না। বললে মজার খেলা ভেঙে যাবে।'

ছেলেটি সাগ্রহে রাজি হল। বুদ্ধিমান ছেলে। ইতিমধ্যেই কালিদাসের মায়ায় পড়ে গেছে।

অমাবস্যার দিন এসে গেল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। কালিদাস ও সুনন্দন দুজনে সেই ঝোপের আড়ালে কায়েমি হয়ে বসে আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে ছেলেটি আর তার "কাকা" বাগান-বাড়ীর দরজায় এল, বাগানে ঢুকল। অল্পক্ষণ পরে "কাকা" বাইরে বেরিয়ে এসে বাগান-বাড়ীর দরজায় হুড়কো টেনে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস ও সুনন্দন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কায়দা করে ফেললেন। লোকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তার হাত পা শক্ত করে বেঁধে ফেলতে দুজনের কোন অসুবিধা হল না। তারপর বাগানে ঢুকে মন্দির থেকে ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে এলেন। এবারে সে কাঁদেনি বটে কিন্তু ভয়ে তার মুখচোখ বসে গিয়েছিল।

লোকটির সামনে ছেলেটিকে এনে কালিদাস বললেন, 'আমরা জানতে পেরেছি যে তুমি ছেলেটিকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছ। এখন আমি যদি বলি অভিচারের উদ্দেশ্যে তুমি ছেলেটিকে এখানে এনেছ তা হলে কী জবাব দেবে বল।'

"কাকা" নিরুত্তর।

কালিদাস বললেন, 'জানো, এ রাজ্যে অভিচার নিকৃষ্টতম অপরাধ ? এবং সে অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড ?'

"কাকা" তবুও চুপ।

তখন কালিদাস ও সুনন্দন দুজনে ঠেলাঠেলি করে লোকটাকে চৈত্য-মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। তারপর কালিদাস বললেন, 'রাজা বা ধর্মাধ্যক্ষ কেউ এখানে হাজির নেই। তাঁদের বদলে

আমরা আছি। আমরা তোমার দণ্ড বিধান করছি। তুমি যেমন এই শিশুকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে আমরাও তোমাকে সেইরকম করতে চাই। এইখানে বন্দী হয়ে থাক। আমরা বেরিয়ে গিয়ে বাগান-বাড়ীর দরজা ইট গেঁথে বন্ধ করে দেব। সুতরাং তোমার পরিত্রাণের কিছুমাত্র আশা নেই। তবে যদি ভূতের হাতে পড়ো তবে পরলোকে তোমার অসদ্‌গতি বিলম্বিত হবে না। আচ্ছা, আমরা এখন আসি।'

কালিদাস ও সুনন্দন বেরিয়ে এলেন। ছেলেটি আগে থেকেই বাইরে ছিল। তার মুখ চোখ থেকে ভয় এখনো মুছে যায়নি।

বাগান-বাড়ীর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কালিদাস হুড়কোটা একটুখানি টেনে দিলেন। লোকটা যদি কোন রকমে ফাঁস খুলে সাহস করে এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দেয় তবে বেরিয়ে আসতে বিশেষ কষ্ট হবে না। নইলে যদ্‌ ভাব্যং তদ্‌ ভবিষ্যতি।

চার পাঁচ দিন পরে কালিদাস ও সুনন্দন ছেলেটিকে নিয়ে মহারাজাধিরাজের শিবিরে হাজির হলেন। ছেলেটির কাহিনী বিক্রমাদিত্যকে জানালেন। বিক্রমাদিত্য ছেলেটিকে কিছু পুরস্কার দিয়ে বললেন, 'একটু বড় হয়ে উজ্জয়িনীতে আমার ওখানে যেও।' সুনন্দনকে বললেন, 'তুমি তো কৌমারভৃত্য, এর ভারও তোমাকে নিতে হবে। ওঁর মাকে নিশ্চিন্ত হতে ব'লো।'

কালিদাসের দিকে ফিরে বিক্রমাদিত্য বললেন, 'এ বয়সে বিদিশা লাগছে কেমন?'

কালিদাস বললেন, 'হেলিওদোরের মতো। মনে হচ্ছে তিনটি অমৃতপদের সন্ধানে সাঁচীতে চলে যাই।'

রাজা বললেন, 'বাজে কথা রাখো। আমাদের অমৃতপদের উৎস সে তো তুমি।'

সকলে সাধুবাদ দিলে। কালিদাস চুপ করে রইলেন।

গুপ্তধন

বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী। জম্বুদ্বীপের সারভূত ভারতবর্ষের গরীয়সী পুরী। পুরীকে উত্তর দিকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে শিপ্রা নদী, অগভীর স্রোতে খরগতিতে। শিপ্রার ধারেই উজ্জয়িনীর অধিদেবতা মহাকাল সমুন্নত মন্দিরে গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত। মন্দিরের তিন পাশে দেবকুল সৌধ-শ্রেণী। নদী-পার্শ্বে অনুচ্চ প্রাচীরের মাঝখানে পাথরের সিঁড়ি নদীগর্ভ পর্যন্ত নেমে গেছে।

সেদিন দণ্ডখানেক আগে সূর্যোদয় হয়েছে। মহাকালের সেবকপ্রধান ও তাঁর দেবকুল-অধ্যক্ষ মধুরক্ষিত প্রাত্যহিক নিয়ম মাফিক চারদিক ঘুরে দেখছেন মন্দিরের কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলেছে কিনা।

মন্দির ঘুরে তিনি ঘাটের দিকে চলেছেন এমন সময় ঘাট থেকে উঠে এসে এক সেবক তাঁর হাতে একটি আংটি দিয়ে বললে, 'আংটিটি ঘাটে এই মাত্র পেলুম। জলের মধ্যে শেষ পৈঁঠার কোলে এটি আটকে ছিল। আমার পায়ে লাগতে আমি হাত লাগিয়ে এটা বার করেছি।'

আংটিটা সোনার, নেহাত হালকা নয়। সরু সোনার পাত, চার দিক ঘিরে খুদি খুদি অক্ষরে কিছু লেখা আছে বলে মনে হয়। লেখা না হয়ে তা অলঙ্করণের রেখাও হতে পারে। লেখার বা রেখার ঠিক মাঝখানে আংটির ব্যাস বরাবর দুটি চিহ্ন আঁকা আছে। একটি পদ্মের অপরটি শঙ্খের।

মধুরক্ষিত আংটিটি উল্‌টে পাল্‌টে ভালো করে দেখলেন। অনুধাবন করে লেখা কি রেখা বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছুই বোঝা গেল না। তিনি মন্দির-সেবককে বললেন, 'সবাইকে বলে দাও এই হারানো আংটির কথা ঘোষণা করতে। কারো যদি দামি আংটি মন্দিরের ঘাটে হারিয়ে গিয়ে থাকে সে যেন আমার কাছে খোঁজ করে।'

লোকের মুখে মুখে হারানো আংটির কথা মন্দির-পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। যার যখন যেদিন যেখানে যে-কোনো রকম আংটি হারিয়েছিল অথবা হারায়নি তারা সবাই ভিড় করে খোঁজ করতে এল মধুরক্ষিতের কাছে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বলে দিলেন—আংটি জমা দেওয়া হয়েছে রাজভাণ্ডারে। প্রকৃত অধিকারী উপযুক্ত প্রমাণ দিলে রাজভাণ্ডার থেকে আংটি ফেরৎ পাবেন।

রাজকুলে যাওয়া আর উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া শুনে সকলেই নিরুৎসাহিত হল। মধুরক্ষিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আংটিটায় যে লেখা অথবা রেখার মতো ছিল তা মধুরক্ষিতকে বিশেষ কৌতূহলী করেছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল হিজিবিজি রেখা ও নয়, ও গূঢ়লিপি অথবা কুটলিপি। যদি গূঢ়লিপি হয় তবে তার পাঠ উদ্ধার করলে একটা সমস্যাপূরণের আনন্দ ও গৌরব লাভ হবে। আংটিটা নিয়ে মযুরক্ষিত খুব মাথা ঘামাতে লাগলেন। কিন্তু পাঠের কোন হদিস মিলল না, সমস্যার কিনারাও হল না। শেষে তিনি ঠিক করলেন, আমি যখন পারলুম না তখন কেউই পারবে না। অতএব কথা রেখে এটাকে রাজভাণ্ডারে জমা দেওয়াই ভালো। একদিন সময় করে রাজকুলে যেতে হবে।

সেইদিনই তাঁর স্ত্রী কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'সে আংটিটার কিছু কিনারা হল?' তিনি ভাবলেন তাঁর স্ত্রী বুঝি সেই লেখা-রেখার পাঠোদ্ধারের কথা বলছেন।

বললেন, 'না। সে হিজিবিজি কিছু পড়তে পারা গেল না। আমিই যখন পারলুম না তখন আর কেউ পারবে কি? ওটা রাজভাণ্ডারে দিয়ে আসব।'

স্ত্রী বললেন, 'তুমি কালিদাসকে দেখিয়েছিলে?'

স্ত্রীর কথায় মধুরক্ষিতের হুঁস হল। মনে মনে লজ্জা বোধ করে বললেন, 'ঠিক তো। বড় ভুল হতে যাচ্ছিল, কালিদাসের কথা মনেই

আসেনি। যাক তুমি মনে করিয়ে দিয়ে বড় ভালো করেছ। আমি আজই বিকেলে আংটিটা কালিদাসকে দেখাতে নিয়ে যাব।'

'অনেক দিন পরে কালিদাসের বাড়ী যাবে, শূন্য হাতে যেও না। কিছু প্রসাদ নিয়ে যেও।'

'ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে গেলে কালিদাস অসন্তুষ্ট হবেন।'

'কেন?'

'তাঁর মতে মহাকালের প্রসাদ-ভোগ তাঁর ভক্ত উপাসকদের, বিশেষ করে দরিদ্র ভক্তদেরই পাওয়া উচিত। রাজ-পারিষদদের ওতে হাত বাড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। যাকে প্রসাদ খেতে হবে সে নিজে খরচ দিয়ে মহাকালের ভোগ চড়াবে।'

'তা হলে বাগান থেকে কিছু ভালো ফুল তুলে নিয়ে যেও।'

'বেশ তাই করব।'

'অনেকদিন তো এ পথ মাড়াননি। আজ কী মনে করে?' কালিদাস বললেন মধুরক্ষিতকে দেখে।

'নানান কাজের অকাজের ঠেলায় আনন্দের অকাজের অবসর পাইনি। আজ এসেছি দায়ে পড়ে।'

'কী দায়ে ঠেকলেন?'

মধুরক্ষিত সব কথা বলে আংটিটা কালিদাসের হাতে দিলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখুন। কিছু পড়তে পারেন কি না।'

আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কালিদাস বললেন, 'এতো হিজিবিজি আঁক নয়, এ হল লেখা—মনে হচ্ছে মূল্যবান লেখা। শ্রেষ্ঠীরা যে অক্ষরে হিসাব-পত্র রাখে ব্যবসা বাণিজ্য চালায় সেই সংক্ষিপ্ত অক্ষরে লেখা। দু একটি অক্ষরের আঁকড় ক্ষয়ে গেছে। তবে তাতে পাঠ উদ্ধারে বাধা হবে না। আপনি এক কাজ করুন। কাল সকালে রাজসভায় আসুন আংটিটা নিয়ে। আমিও থাকব।'

'কাল সকালে সভায় যাওয়ায় আমার অনেক অসুবিধা।

রাজসভায় হাজিরা দিতে এমনিই আমার এখন মন সরে না।'

'কেন?'

'সবাই বলবে—মুখে না বলুক মনে ভাববে—এ লোকটা এতদিন এমন মূল্যবান আংটি পাওয়ার খবর চেপে রেখেছিল কেন? না না। আংটি আপনার হাতেই দিচ্ছি, আপনি যা হয় করবেন। আমাকে আর রাজসভার বেড়াজালে জড়াবেন না।'

কালিদাস হেসে বললেন, 'বেশ। তাই হবে।'

পরের দিন রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কালিদাস শারদানন্দের হাতে আংটিটা দিয়ে মধুরক্ষিতের কাছে শোনা ওটির প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনা করলেন। বিক্রমাদিত্য শুনে উৎসুক হয়ে আংটিটা নিয়ে দেখলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার? কি লেখা আছে এতে?'

কালিদাস বললেন, 'লেখা আছে একটি শ্লোক শ্রেষ্ঠী-সমাজে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত অক্ষরমালায়। পদ্ম-শঙ্খের চিহ্ন থেকেও বোঝা যায় যে কোন এক শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল এটি। দেবপাদ আমাকে লিপিটি পড়তে আজ্ঞা দিলেন বটে কিন্তু আমি ইতস্তত করছি। আংটিতে উৎকীর্ণ শ্লোকটির মর্মার্থ যা আমি অনুধাবন করছি তাতে বোধ হচ্ছে এতে কোন সুগুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং শ্লোকটি এখন সভায় বাচন করা সঙ্গত হবে না। এখন দেবপাদ যা বলেন।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সাধুস্তাবৎ। কিন্তু এর বিহিত তো করতে হয়।'

কালিদাস বললেন, 'মহামন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে আমি বলি কি উজ্জয়িনীর ও উজ্জয়িনীর আশে পাশে যে সব শ্রেষ্ঠীর পাড়া ও গ্রাম আছে সেখানে এই অঙ্গুরীয়-প্রাপ্তির সংবাদ বিজ্ঞাপিত হোক। বলা হোক যার সম্পত্তি সে যেন মহামন্ত্রীর কাছে তার দাবি জানায়। যিনি প্রকৃত অধিকারী সাব্যস্ত হবেন তাঁকে শ্লোকটি জানানো হবে এবং মহা-

মন্ত্রীর তদারকিতে সেই ধনভাণ্ডার-উদ্ধার কার্য চালানো হবে। উদ্ধার হলে পর অধিকারীর যা প্রাপ্য তা তিনি পাবেন।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'উত্তমঃ কল্পঃ। কিন্তু আংটির বিজ্ঞাপন-প্রচার শুধু উজ্জয়িনীর আশ-পাশ পর্যন্তই বা দেওয়া হবে কেন? রাজ্যের সর্বত্র দিলেই তো হয়।'

কালিদাস বললেন, 'যেদিন সকালে মন্দির-ঘাটে আংটিটা পাওয়া গেছে তার আগের দিনে ছিল মহাকালের বিশেষ সাপ্তাহিক পূজা। মনে হয় কোন এক পূজার্থী যখন স্নান করছিল তখনই এটা পড়ে যায়। এ পূজায় উজ্জয়িনীর ও আশ-পাশের লোকেরাই বেশি আসে, দূরের কেউ বড় আসে না। দু-দশ দিন দেখে যদি দাবিদার না পাওয়া যায় তবে বিজ্ঞাপন আরও দূরে দূরে প্রচার করতে হবে। মহামন্ত্রী কি বলেন?'

'উত্তম পরামর্শ।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ তাই হোক।'

রাজার কথা কালিদাস কাটলেন আর রাজা তা মেনে নিলেন। এ ব্যবহার সভাসদ পণ্ডিত বররুচির কানে একটুও ভালো শোনালো না। শ্লেষ করে বললেন, 'শ্লোক আমাদের না হয় না শোনালেন কিন্তু দেবপাদকে এবং মহামন্ত্রীকে শোনাতে আপত্তি কী?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আপত্তি আছে। এ সভা রহস্য অধিবেশন নয়, এ প্রকাশ্য সভা। এ সভায় যে আলোচনা হবে তা প্রকাশ্য আলোচনা। এ সভায় যাঁরা উপস্থিত থাকবেন তাঁরা সবাই তা শোনবার অধিকারী। না, শ্লোকের পাঠোদ্ধার এখন থাক্। মহামন্ত্রী ও কালিদাস এই গুপ্তধন অনুসন্ধান কার্যের ভারপ্রাপ্ত হলেন। ওঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল আমরা আর একদিন এমনি প্রকাশ্য সভায় শুনব।'

সেদিন সভা আর জমল না। আংটির রহস্য অনেককেই বিচলিত করেছিল—লোভে এবং ঈর্ষায়।

সভা শেষ হলে কালিদাস ও শারদানন্দ একান্তে আলাপ করতে

উঠে গেলেন।

দিন পাঁচ সাত পরেকার কথা। কালিদাস মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে রাজবৎ আচরণ করছেন এমন সময় ডাক এল রাজকুল থেকে। এখনি কালিদাসকে শারদানন্দের অধিকরণে যেতে হবে। আট বেহারার পালকি এসেছে তাঁকে নিতে। কালিদাস অমনি বেরিয়ে পড়লেন।

শারদানন্দের অধিকরণে গিয়ে দেখলেন মহামন্ত্রী নিজের খাস কামরায় বসে, তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছেন। একটু দূরে বসে আছেন এক ব্যক্তি—শীর্ণকায়, চুল কাঁচাপাকা, বুড়ো গোছের দেখতে, পরিধান বসন খুব পরিচ্ছন্ন নয়। দেখলে মনে হয় পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, ভদ্র পরিবারের লোক, অধুনা অসচ্ছলতার মধ্যে তাঁর সংসার চলছে।

কালিদাস ঘরে ঢুকতেই শারদানন্দ উঠে দাঁড়ালেন।

লোকটিও উঠে দাঁড়াল। কালিদাস বললেন, 'কে ইনি?'

'আংটির মালিক।'

'আপনার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত?'

'হাঁ। ইনি আংটির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সর্বাংশে মিলেছে। অতঃপর যা করবার আপনি নির্দেশ করুন।'

কালিদাস লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'আমার নাম শ্রীপুষ্পদত্ত, পিতার নাম ঈশ্বর পুণ্যদত্ত। পিতামহের নাম ঈশ্বর পুষ্টদত্ত, প্রপিতামহের নাম ঈশ্বর পূর্ণদত্ত। দশ পুরুষ যাবৎ আমাদের নিবাস পদ্মপর্ণ গ্রামে। এখান থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে পূব দিকে। আমি সেদিন মহাকালের পূজা দিতে এসে স্নান করবার সময় আংটিটি হারিয়েছি। হুঁশ ছিল না তাই ঘাটে হাতড়াই নি। যখন খেয়াল হল আংটি নেই তখন বেলা পড়ে এসেছে। চোখের তেজ কমে গেছে। তাই খোঁজ করিনি। যখন যাবার হয় যায়।'

পুষ্পদত্তের শান্ত করুণ মুখ এবং হতাশ মৃদু বচনে কালিদাস

আকৃষ্ট হলেন। তিনি একটি একটি প্রশ্ন করে তার বর্তমান অবস্থা, ঘর বাড়ীর কথা তার পূর্বপুরুষের কাহিনী সব জেনে নিলেন। পুষ্পদত্তের দু ছেলে দু মেয়ে। বড় ছেলে সামান্য ব্যবসা করে ভুসি মালের। ছোট ছেলে চাষবাসের কাজে বাপকে সাহায্য করে। বড় মেয়ে বিবাহিত, শ্বশুর-বাড়ীতেথাকে। ছোট মেয়ে বিবাহযোগ্য,বিবাহে বাধা অর্থাভাব। ওঁদের শ্রেষ্ঠীসমাজে ধনীর সংখ্যাই বেশি। ধনীরা নির্ধন ঘরের মেয়ে আনতে চায় না। পুত্র দুজনেই অবিবাহিত। বড়র বিবাহের বয়স হয়ে গেছে, তারও সুবিধামত পাত্রী জুটছে না। পূর্বপুরুষ ধনী ছিলেন, পিতার আমল পর্যন্ত তাঁদের বড় কারবার ছিল। এখন সংসার চলে পৈতৃক জমিজমার আয় থেকে। তাতে খাওয়া-পরা চলে, সামাজিক ব্যবহার চলে না। তবে মহাকাল কোন রকমে চালিয়ে দিচ্ছেন। চলে গেলেই হল।

আংটির একটু ইতিহাস আছে। ও আংটি ওঁর প্রপিতামহ গড়িয়ে ছিলেন। তিনি ধারণ করতেন। তারপর থেকে তাঁর পিতামহ ও তাঁর পিতা পরেছেন, এখন তিনি পরছিলেন। এঁরা সবাই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রপিতামহের নির্দেশ ছিল যে এই আংটি বড়ছেলে পাবে। তিনি নাকি তাঁর বড়ছেলে অর্থাৎ পুষ্পদত্তের পিতামহকে বলে গিয়েছিলেন যে এই আংটিতে গুপ্তধনের সংকেত আছে কিন্তু সে গুপ্তধনে কেউ যেন হাত না দেয়। এই মর্মে বড়ছেলেদের শপথ করতে হয়। পুষ্পদত্তও করেছিলেন। গুপ্তধনকে অস্পৃশ্য করে রাখবার কারণ, যা পুষ্পদত্ত তাঁর পিতার মুখে শুনেছিলেন, তা হল এই যে পূর্ণদত্তের গুরু তীর্থযাত্রা কালে তাঁর নিজস্ব ও পৈতৃক ব্রহ্মত্র ধনরত্ন (গুরুর পিতা ও পিতামহ রাজগুরু ছিলেন) শিষ্যের কাছে গচ্ছিত রেখে যান। তিনি নাকি বলেছিলেন যে আমি যদি না ফিরি তুমি সব নিয়ো। গুরুই নাকি গুপ্তধন রাখবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গুরু আর ফেরেননি। পূর্ণদত্ত কিন্তু গুরুর ধন তাঁর গচ্ছিত ন্যাস বলেই ভেবে এসেছিলেন এবং তাঁর উত্তরপুরুষকে সেইমত আজ্ঞা করেছিলেন।

পুষ্পদত্ত তাই এত অভাবে সত্ত্বেও গুপ্তধনের কোন সন্ধান করেনি। পূর্বপুরুষের ভুক্ত অঙ্গুরীয়কটির প্রতি পুষ্পদত্তের বিশেষ টান আছে। তাই দারুণ অভাবে পড়েও কখনো সে তার অলঙ্কারটি বন্ধক দেবার বা বিক্রয় করবার কথা ভাবেনি।

ঘরবাড়ীর প্রসঙ্গে পুষ্পদত্ত বললেন, 'আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের দালান বাড়ী আমার পিতার আমলেই প্রায় অব্যবহার্য হয়ে এসেছিল। তার পরে ভেঙে পড়েছে। আমরা এখন থাকি মাঠকোঠায়। কোন অসুবিধা নেই। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা শীতকালে গরম। প্রপিতামহ কিছু অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন কিনা বলছেন? হাঁ, তিনি বাড়ীর পাশে এক পুকুর কাটিয়ে তার তীরে বটবৃক্ষ ও শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর বাড়ীর দিকে পুকুরের ঘাট ভালো করে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। হাঁ, সে ঘাট সকলেই ব্যবহার করে। আমরাও করি পাড়ার লোকেও করে। ঘাটের পৈঠার কথা বলছেন? ধারের রানা দুএকটা বেঁকে চুরে গেছে। কিন্তু সিঁড়ি সব অটুট আছে, যেন বজ্রপাথরে তৈরি। আমাদের বাড়ীর কথা বলছেন? আমাদের ভিটে চারদিকে পাঁচির ঘেরা। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের ইঁটের পাঁচির। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। সেখানে মাটি দিতে জুড়ে দিয়েছি। আমাদের ভিটের উপর দিয়ে কোন আসা যাওয়ার পথ নেই। বট গাছটা পুকুরের কোন্‌খানে আছে বলছেন? আছে বাঁধানো ঘাটের রুজুরুজু ঠিক ওপারে।'

পুষ্পদত্তের কথা শুনে কালিদাস বললেন, 'আপনাকে এখানে একটু-খানি থাকতে হবে। আপনার সঙ্গে আমাদের লোকজন দিয়ে আজই আপনাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবো। উজ্জয়িনীতে কোথাও যদি কিছু কাজ থাকে তো সেরে আসতে পারেন।'

'না, কাজ কিছু নেই। তবে একবার মহাকালকে প্রণাম করে আসতুম আংটিটার জন্যে।'

'সে না হয় দুদিন পরেই এবং ভালো করেই করবেন। আগে

আংটিটা হাতে আসুক তবে।'

'আজ ওটা পাব না?'

'না, আমাদের কাজ এখনো মেটেনি। মিটলেই ফেরত পাবেন। আচ্ছা, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আমাদের একটু কথা আছে।'

পুষ্পদত্ত চলে গেলে শারদানন্দ বললেন, 'রহস্যের সমাধান কতদূর?'

'হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। তবে শুনুন ব্যাপারটা।'

একটু পরে পুষ্পদত্তকে ডেকে পাঠানো হল। শারদানন্দ তাঁকে বললেন, 'আপনাকে আমরা শকটে করে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার সঙ্গে যাঁরা যাবেন তাঁরা রাজকুলের কর্মচারী। তাঁরা আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সেখানে অনুসন্ধান কার্য চালাবেন। কেউ যেন তাঁদের কাজে কোন বাধা না দেয়। আশা করছি রাত্রির ভিতরে ওঁদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। সকালে ওঁদের সঙ্গে আপনি সরাসরি রাজসভায় আসবেন। সেখানে আপনাকে আংটি ফেরৎ দেওয়া হবে। বাড়ী গিয়ে আপনি কারো কাছে এ সব কথা প্রকাশ করবেন না। করলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।'

পুষ্পদত্ত স্বীকৃত হলেন।

পরদিন। রাজসভা বসেছে। এ অধিবেশন উৎসবের নয়, প্রতিদিনের রাজকার্যের। সভার শীর্ষে বিক্রমাদিত্যের আসন। তাঁর বাঁয়ে কালিদাস ডাইনে শারদানন্দ। পিছনে পাত্র-মিত্র ও রাজকর্মচারিগণ। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের পাদপীঠের নীচে মাঝখান দিয়ে সরু খোলা পথ চলে গেছে সভাদ্বার পর্যন্ত। সে পথের ডাইনে বাঁয়ে সভাসদদের, আমন্ত্রিত ও অতিথিদের এবং প্রজাবর্গের আসন। সভাদ্বারে দুজন রক্ষী।

দেবপাদ সিংহাসনে উপবেশন করলে পর শারদানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ প্রথমেই সেই আংটির বিচার হবে। আপনারা

সকলে হয়ত আংটির কথা জানেন না। তাঁদের আমি সংক্ষেপে বলছি।'

মধুরক্ষিতের আংটি পাওয়া থেকে পুষ্পদত্তের দাবি স্বীকার পর্যন্ত ব্যাপার শারদানন্দ বর্ণনা করলেন। তার পর বললেন, 'এ রহস্যের ভেদ কালিদাস করেছেন। সে কাহিনী এখন তিনিই বলবেন।'

কালিদাস বললেন, 'পুষ্পদত্ত অবিলম্বে এসে পড়বেন। তাঁর জন্যে আমাদের অপেক্ষা না করা অসঙ্গত হবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যথার্থ কথা। বিচারের ফলভোগীর উপস্থিতি অবশ্যই কাম্য।'

সভায় মৃদু মধুকরগুঞ্জনধ্বনি উঠল।

আধদণ্ডটাক পরে সভাদ্বারে পুষ্পদত্তকে দেখা গেল। তার পিছনে অগ্নি ও বেতাল দুটি বড় তামার হাঁড়ি নিয়ে। শারদানন্দ উঠে গিয়ে পুষ্পদত্তকে রাজার সামনে আনলেন। রাজা তাঁকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কালিদাস আসনে বসেই বলতে শুরু করলেন,

'আংটিতে এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—

"জনতারক্ষিণী যস্য ধনদো বা অবেক্ষকঃ।
তদ্ ধনং বসুধাগুপ্তং হারাবতারনায়কে॥"

'শ্লোকটির রচনা যেমন সহজ, সমগ্র অর্থ তেমন সহজলভ্য নয়। শ্লোকটি পড়ে আমার মনে হয়েছে এতে কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডের সন্ধান-সংকেত নিবদ্ধ আছে। সংকেত ভেঙে একটা সঙ্গত অর্থও পেয়েছি। কিন্তু আমার উপলব্ধ অর্থসঙ্গতি এখানে খাটবে কিনা অর্থাৎ সে অর্থ এই ধনভাণ্ডের কুলুপ খুলে দেবে কিনা জানবার কোন হদিস নেই। স্থান কাল ও পাত্রের মোটামুটি একটা নির্দেশ না পেলে এমন সমস্যার বাস্তব পূরণ হয় না। তবে কাল অনেকটা আন্দাজ করতে পারা যায় অক্ষরের ধাঁচ দেখে। কিন্তু কে কোথায় কবে সে ধনভাণ্ড নিগূঢ় করেছিল এবং সেই আংটিতে তার নির্দেশ অঙ্কিত করেছিল তা জানা নেই, আন্দাজ করারও উপায় নেই। সেই কারণে আমাদের অপেক্ষা

করতে হয়েছিল আংটির মালিককে খুঁজে পাবার জন্যে। আংটির মালিক পাওয়া গেছে—এই ইনি পুষ্পদত্ত। এঁর মুখে এখন আংটির ইতিহাস শুনুন।'

পুষ্পদত্ত কালিদাসের আহ্বানে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আংটির ইতিহাস—যা কালিদাস খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিলেন সব বললেন। তাঁকে উপবেশন করতে ইশারা করে কালিদাস তাঁর ব্যাখ্যান শুরু করলেন।

'পুষ্পদত্তের কাছে শুনে আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে ওঁর প্রপিতামহ যিনি এই নিধি গচ্ছিত নিয়েছিলেন তা তাঁর প্রতিষ্ঠিত পুকুরঘাটের একটা সিঁড়ির নীচে মাটিতে পোঁতা আছে। ঘাটে সবশুদ্ধ নটা সিঁড়ি তার মধ্যে যেটা মাঝের অর্থাৎ পঞ্চম তার নীচেই ধনভাণ্ড আছে। "হারাবতারনায়ক" মানে নামবার সোপান-শ্রেণীর মাঝের সিঁড়ি। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে লোক সর্বদা ওঠানামা করে, সুতরাং জনতা যেন ধনভাণ্ডের পাহারাদার, আরক্ষিণী। ঘাটের ওপারে বটগাছ যক্ষরাজের আধষ্ঠান বৃক্ষ, তিনি যেন সর্বদা নজর রাখবেন, "ধনদো বা অবেক্ষকঃ।" আর বসুধাগুপ্তঃ মানে সকলেই জানে—মাটিতে পোঁতা।

'অগ্নি আর বেতালকে পাঠানো হয়েছিল পুষ্পদত্তের সঙ্গে। সেই পৈঁঠা ভেঙে মাটি খুঁড়ে এই দুটি ধনভাণ্ড বেরিয়েছে। এখন দেবপাদঃ প্রমাণম্।'

রাজা বললেন, 'ধনের পরিমাপ করা হোক।'

রাজভাণ্ডারী তুল-দাঁড়ি এনে মাপলেন। মুদ্রা, পুরুষের আভরণ, পূজাপাত্র, মূর্তি—বৃক্ষ, গাভী, হস্তী, অশ্ব ও বরাহ—সব নিরেট সোনার। ওজন হল দেড় মণের উপর।

রাজা বললেন, 'পুষ্পদত্ত তুমি এ ধনভাণ্ডার গ্রহণ কর।'

আভূমি প্রণত হয়ে পুষ্পদত্ত বললেন, 'পুরুষানুক্রমে প্রতিজ্ঞাত গচ্ছিত ধন নিই কী করে। মহারাজাধিরাজ, আমাকে ক্ষমা করতে আজ্ঞা হয়। আমার আনন্দ হয়েছে আংটিটি পাব বলে, আর দুঃখ

হচ্ছে প্রাচীন ঘাটটি নষ্ট হয়েছে বলে।'

শারদানন্দ বললেন, 'এই নাও তোমার আংটি। ঘাটের দুঃখও দূর করা হচ্ছে। ও ঘাট সম্পূর্ণ নতুন করে আগেকার চেয়েও ভালো করে গেঁথে দেওয়া যাবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আপনার কথায় খুসি হয়েছি। আপনিই সত্যকার সাধু। আপনার সাধুত্বের সম্মান রাজকুল দেবে। আজ থেকে আপনি আমার সভাসদ হলেন। আপনি আপনার কাজ করে যাবেন। আপনার সংসারের চিন্তা রাজভাণ্ডারের।'

প্রশংসাগুঞ্জনে সভাগৃহ মুখরিত হল।

কন্যাদায়

রাত্রিতে বেশ গরম গেছে। প্রায় সারারাত ছটফট করে কালিদাস ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই সকালে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে তিনি বাইরে এসেছেন। এমন সময় জরুরি ডাক এল। মহাকাল মন্দিরের অধ্যক্ষ ধর্মাধিকরণিক মধুরক্ষিত পালকি পাঠিয়ে দিয়েছেন এক লাইন চিঠি দিয়ে, সব কাজ ফেলে এখুনি একবার আস্‌তে হবে।

মধুরক্ষিত কালিদাসের যৌবনকাল থেকে সুহৃদ্‌। নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুতর কিছু বিপদ ঘটেছে তাঁর। কালিদাস তখনি পালকিতে উঠলেন।

মহাকাল মন্দিরের তোরণদ্বারে পালকি থামল। তোরণদ্বার রুদ্ধ। কালিদাসের আশঙ্কা দৃঢ়তর হল। তিনি পালকি থেকে বেরিয়ে এলেন। তোরণদ্বার খুলে গেল। কালিদাস দ্বার পেরুলেন। দ্বার আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পূজা-মন্দিরের সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলেন উপরে অধ্যক্ষ মধুরক্ষিত দাঁড়িয়ে আছেন, কাছে আছে মন্দিরের প্রধান মালী জীবক। অধ্যক্ষের মুখ গম্ভীর, মালীর মুখ ভীত চকিত।

অধ্যক্ষ নেমে এসে কবির হাত ধরে উপরে উঠে গিয়ে কোন কথা না বলে গর্ভগৃহের সামনের দীর্ঘ গ্যালারিতে ঢুকে ভিতরে একপাশে এক ঢাঁই ফুল-বেলপাতার মধ্যে একটি মেয়ের দেহ শায়িত দেখালেন। অল্প-বয়সী সুন্দরী মেয়ে, সাজ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিল।

কালিদাসের হাত ছেড়ে দিয়ে মধুরক্ষিত ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'এই মৃতদেহ নিয়ে করি কী! বলে দাও আমাকে।'

কালিদাস বললেন, 'দাঁড়াও। বুঝি। কতক্ষণ মরেছে?' এই বলে কালিদাস ঝুঁকে দেহটির কণ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন। তারপর খাড়া হয়ে উঠে বললেন, 'না মরেনি। এখনও প্রাণ আছে। তুমি ধন্বন্তরিকে এখান থেকে নাও। যদি কোন রকমে বাঁচাতে পারা যায়।'

মধুরক্ষিত বললেন, 'তাই হোক মহাকালের দয়ায়। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

ধন্বন্তরিকে ডাকতে তখনি লোক গেল। কালিদাস তখন ঘটনাটির আদ্যোপান্ত জানতে চাইলেন।

মধুরক্ষিত বললেন, 'আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে আসব আসব মনে করছি এমন সময় জীবক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে আমাকে বললে, এখুনি মন্দিরে আসুন, সর্বনাশ হয়েছে। ওর সঙ্গে দৌড়ে এসে ফুল বেলপাতার মধ্যে তরুণী পূজারিণীর অক্ষত অবিপর্যস্ত মৃতদেহ শয্যাশায়িতবৎ দেখে হতভম্ব। বুদ্ধির জড়তা কেটে যেতেই তখুনি তোমাকে ডেকে পাঠালুম। তার পর তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।'

কালিদাস মালীকে কছে ডাকলেন। বললেন, 'জীবক তুমিই তা হলে একে ফুলবেলপাতার মধ্যে দেখে অধ্যক্ষকে খবর দিয়েছিলে। কেমন?'

'আজ্ঞে হাঁ। শেষ প্রহরের পূজার পর সারা দিনের পূজা করা ফুল বেলপাতা গর্ভগৃহের বাইরে অলিন্দের একপাশে জড় করে রাখা হয়। সকালে আমি অথবা আমার সহকারী কেউ এগুলি সরিয়ে বাইরে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মন্দির ধোয়া পোঁছা হয় না। আজ সকালে সেই কাজ করতে এসে ফুল বেলপাতার গাদার মধ্যে চাপা পড়া এই লাস দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গে কর্তা মশায়কে খবর দিয়েছি।'

কারো দিকে না চেয়ে কালিদাস প্রশ্ন করলেন, 'মেয়েটি চেনা না অচেনা?'

ধর্মাধ্যক্ষ বললেন, 'আমার অচেনা।'

মালী বললে, 'আমার মুখ-চেনা।'

মালীর দিকে চেয়ে কালিদাস বললেন, 'তোমার মুখ-চেনা? কী রকম?'

'অনেক দিন সকালে ওকে পূজা করে ফিরে যেতে দেখেছি। মনে হচ্ছে কোন কোন দিন ওকে সন্ধ্যাবন্দনায় নৃত্যারম্ভেও দেখে থাকব।'

অধ্যক্ষের দিকে চেয়ে কালিদাস বললেন, 'আজ সকালে তোরণে যে দ্বারী ছিল তাকে একবার ডাকো।'

দ্বারী এল। মন্দিরের প্রধান দৌবারিক। নাম রুদ্রভট। সে বললে, 'এ আমার মুখ-চেনা। প্রায়ই খুব সকালে পূজা দিতে আসে। নর্তকীদের দলেও ওকে এক আধ বার দেখেছি। মনে হয় কোন বেশে[১] থাকে।'

কালিদাস মধুরক্ষিতকে বললেন, 'খুব সকালে আজ কোন্ ব্রাহ্মণ পূজার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন?'

অধ্যক্ষ বললেন, 'জানি না, খোঁজ নিচ্ছি।'

মালী বললে, 'আজ সকালে সেবায়েত ছিল সোমদত্ত।'

এমন সময় ধন্বন্তরি এসে গেলেন। কালিদাস তাঁকে বললেন, 'দেখুন বাঁচাতে পারেন কিনা। হয়ত দেরি হয়ে গেছে।'

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন ধন্বন্তরি। শেষে দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখনও শ্বাস আছে। বুঝতে পারছি না বড্ড দেরি হয়ে গেছে কিনা। তবে এখান থেকে এখুনি সরানো দরকার এবং খুব সন্তর্পণে।'

দেহটি তখনি সরানোর কথায় অধ্যক্ষের মুখের রঙ একটু হালকা

---

১ 'বেশ' তখনকার দিনের বড় বড় সহরে ধনী বণিক ও অন্য পথিকদের রাত্রিবাস স্থান। সুন্দরী মেয়েরা পরিচর্যা করত। অধিকারিণী মহিলা। পরবর্তী কালে বেশের মেয়ের নাম হয়েছে বেশ্যা। আগে ওরা ঘৃণ্য ছিল না। সমাজে ওদের মর্যাদা ছিল। মৃচ্ছকটিক দ্রষ্টব্য।

হল। তিনি বললেন, 'পাশেই যোগিনীমঠ খালি রয়েছে। সেখানে সরালে সব দিক দিয়েই সুবিধা হবে।'

সমস্যা হল মৃতকল্প দেহটিকে সরানো নিয়ে। লোক জানাজানি না হয় এবং দেহতে একটুও যেন কোন রকম চোট না লাগে এমনভাবে তুলে নিয়ে যেতে হবে। অধ্যক্ষ মহাভাবনায় পড়লেন। কালিদাস তাঁকে অভয় দিয়ে তখনি রাজকুল থেকে দেবপাদের খাস নফর অগ্নি ও বেতালকে ডেকে পাঠালেন। (প্রয়োজন মতো এই দুজনের বেগার নেবার অধিকার বিক্রমাদিত্য দিয়েছিলেন কালিদাসকে।)

অল্পক্ষণ মধ্যেই তাল-বেতাল এসে পড়ে অতিশয় সন্তর্পণে তরুণীর দেহটি পাশের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একতলার একটি কক্ষে নরম বিছানায় শুইয়ে রাখলে। ধন্বন্তরি কালিদাস ও মধুরক্ষিত অনুগমন করে সেখানে এলেন।

ধন্বন্তরি রোগিণীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করতে লাগলেন। কালিদাস ও মধুরক্ষিত বাইরের ঘরে চুপ করে অপেক্ষা করে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে ধন্বন্তরি সে ঘরে এলেন। বললেন, 'এখনও জীবিত, তবে আট প্রহর না কাটলে কিছুই বলা যায় না। চব্বিশ প্রহর কাটলে অবশ্যই বেঁচে যাবে।'

কালিদাস বললেন, 'হয়েছিল বা হয়েছে কী?'

'মাথার পিছনে চোট। খোঁচার মত কিন্তু স্থূলাগ্র কোন কঠিন বস্তুর আঘাতে মস্তিষ্কে চোট লেগেছে। ঔষধ দেবার বিশেষ কিছু নেই। দরকার শান্ত শুশ্রূষার। অল্প বয়স, সুতরাং মস্তিষ্কের আঘাত ধীরে ধীরে আপনি সেরে ওঠা অসম্ভব নয়। আমি এখন যাই। প্রহরে প্রহরে এসে দেখে যাব। আপনারা পাহারা রাখুন, কোন রকম গোলমাল যেন না হয়। আর সব ভার আমার।'

ধন্বন্তরি চলে গেলেন। অগ্নি ও বেতালকে সতর্ক পাহারায় রেখে কালিদাস ও অধ্যক্ষ উঠলেন। যোগিনীমঠে বেশিক্ষণ জটলা করা ঠিক নয়।

অধ্যক্ষ-আবাসের দিকে চলতে চলতে কালিদাস বললেন, 'তুমি আমি, মালী, দৌবারিক ও ধন্বন্তরি—এই পাঁচজন মেয়েটির হত্যাকাণ্ড জেনেছি। দেখো, আর যেন কেউ একটা না শোনে। ছ জোড়া কানকে ঠেকানো যাবে না। আর একথা কথা। মন্দিরদ্বার আর বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা উচিত নয়। তুমি প্রহরীকে দিয়ে দেউড়িতে বলে পাঠাও যে গর্ভগৃহের জরুরি সংস্কারের জন্যে মন্দিরে প্রবেশ কিছু সময়ের মতো বন্ধ আছে তবে শীঘ্রই খোলা হচ্ছে।'

অধ্যক্ষ সেই মতো আদেশ দিলেন।

মধুরক্ষিতের কোয়ার্টারে এসে কালিদাস বললেন অধ্যক্ষের কৃত্যককে, 'এইবার তোমাদের সকালের সেবায়েতকে আনাতে হবে। কোথায় আছে সে জানো?'

'না। খোঁজ করছি। মন্দির-বেড়ের মধ্যেই আছে।'

মালী ছুটল সেবায়েতের সন্ধানে। তাকে পাওয়া গেল সেবক-বিহারে তার নিজের কুঠুরিতে। মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

সেবায়েত এসে হাজির হল। তরুণ, সৌম্যমূর্তি। চুল উস্‌কো খুস্‌কো, চোখ লাল। মুখ শুখনো ও গম্ভীর। অধ্যক্ষ বললেন, 'বস।' সে চৌকি নিলে না, মাটিতেই বসে পড়ল।

কালিদাস বললেন, 'নাম কী তোমার?'

'সোমদত্ত।'

'বাড়ী কোথায়?'

সোমদত্ত তার গাঁয়ের নাম বললে। সেখান থেকে দশ বারো ক্রোশ দূরে।

'কতদিন মন্দিরে কাজ করছ?'

'দু বছর আড়াই বছর হবে।'

'আজ প্রত্যূষে পূজার অধিকারে ছিলে তুমি?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'কোনো অঘটন ঘটেছিল কী?'

সোমদত্ত মুখ নীচু ক'রে নীরব রইল।

কালিদাস বললেন, 'ভয় বা লজ্জা ক'রো না। তুমি মহাকালের সেবক। সত্য কথায় ভয় কি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঢোঁক গিলে সোমদত্ত বললে, 'আজ খুব সকালে একটি মেয়ে এসেছিল পূজা দিতে। পূজা দিয়ে ফিরে যাবার সময় সে গম্ভীরার বাইরে এসে পা পিছলে পড়ে যায়, দেওয়ালে তার মাথা ঠুকে যায়। আমি কাছে গিয়ে দেখলুম তার শরীর স্থির, নিঃস্পন্দ। বুঝলুম দেহে প্রাণ নেই। পাছে কোন পূজারী এসে পড়ে এই দৃশ্য দেখে ভড়কে যায় তাই আমি পাশে জড়ো করা ফুল বেলপাতা দিয়ে সে দেহ ঢেকে দিই। তারপর কর্তাকে খবর দেবার জন্যে তাঁর আবাসে ছুটে আসি। কিন্তু তিনি তখনও বাইরে আসেন নি। আমার মাথার ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণা করছিল, তাই আমি এখানে অপেক্ষা না করে সেবক-বিহারে আমার ঘরে চলে যাই। সেখানে ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। বড়ো মালী আমাকে ডেকে আনলে।'

কালিদাস বললেন, 'মেয়েটিকে তুমি আগে কোন দিন দেখেছিলে কী?'

'হাঁ, প্রায়ই সকালে সে পুজা দিতে আসে।'

'অন্য কোন দিন দেখেছ কী? অন্য কোথাও?'

'অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আর একদিন দেখেছিলুম।'

'কবে কখন বল।'

'মাস পাঁচ ছয় আগে ওকে আমি প্রথম দেখি মহাকালের সন্ধ্যা-বন্দনায় একদিন ত্রিপুরবিজয় গায়িকাদের দলে গান করতে।'

'ওর নাম কী জান?'

'জানি মন্দারমালা।'

'কোথায় থাকত জান না বোধ হয়।'

'হাঁ জানি। মাথুরিকার বেশে।'

'এত খবর জান। তা হলে বল তোমার সঙ্গে ভাবসাব হয়েছিল?'

সোমদত্ত ঘাড় নীচু করে চুপ করে রইল। কালিদাসও উত্তরের প্রতীক্ষায় চুপ করে রইলেন।

একটু পরে গলা ঝেড়ে মাথা তুলে সোমদত্ত বললে, 'ওকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি। আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ছেলে বেলার খেলার সঙ্গী। ওর সঙ্গে পাঠশালায়ও পড়েছি। আমি যখন নাম-মালা মুখস্থ করতুম ও তখন সিদ্ধিরস্তু পড়ত।' বলতে বলতে ছেলেটির চোখ চকচক করে উঠল।

কোমল কণ্ঠে কালিদাস বললেন, 'তোমাদের ছেলেবেলার কথা যা মনে আসে বল। লজ্জা বা ভয় ক'রো না। দেশে তোমার বাপ-মা আছেন?'

সোমদত্ত বললে, 'না, বাবা আমার শৈশবেই স্বর্গলাভ করেছিলেন। মা বছর আড়াই তিন হল দেহত্যাগ করেছেন। তার পরেই আমি এখানে চলে আসি।'

'বল তোমাদের কাহিনী।'

'মালা, মানে মন্দারমালা, আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। ওদের বাড়ী আমার পাড়ায় না হলেও খুব কাছে। ওরা আমাদের স্বজাতি, শুনেছি ক পুরুষ আগে ওদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। মালা ও তার মা ভিন্ন ওদের আর কেউ ছিল না, দু এক ঘর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া। মালার মা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন, আমার মা কখনো-সখনো ওদের বাড়ী যেতেন। ছেলে-বেলায় মালা আমাদের বাড়ীতে নিজেদের বাড়ীর মতোই আচরণ করত।

'পাড়াপড়শিরা ভাবত, ছেলেমেয়ে দুটির নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। মালার মায়েরও যে সে বিশ্বাস ছিল তা আমরা টের পেয়েছিলুম।

'মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হলে মালার মা আমার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব করে লোক পাঠালেন। মা বললেন, মেয়ে ভালো ঘর ভালো। কিন্তু শুখনো শ্বশুরবাড়িতে আমার ছেলের কদর হবে

না। শালী শালাজ নেই, শালা শ্বশুর নেই, শ্বশুর বাড়ীর কোন সুখই আমার ছেলে পাবে না। আমার একটি মাত্র ছেলে, ওখানে বিয়ে দিই কি করে?

'ছেলেবেলার খেলাঘর আমাদের ভেঙে গেল। মা খুঁজে পেতে আমার জন্যে ভালো বউ নিয়ে এলেন। তবে শ্বশুরবাড়ীর জলুস ছিল তা। তাঁরা বড়লোক, তবে বাপ ও মেয়ের সংসার। সম্পত্তি সব মেয়ে-জামাই পাবে।

'আমার বউ ঘর করতে এল। মালারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল মামার বাড়ীতে, অনেক ক্রোশ দূরে।'

'কিছু কাল কাটল। বর্ষাকালে একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘরে আমার বউকে হাঁউমাউ করে ভয় দেখালুম, নিতান্ত ঠাট্টার ছলে। ওর যে অত ভূতের ভয় ছিল তা জানতুম না। ভয় পেয়ে সে ঘর থেকে পালাতে গিয়ে দরজায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এমনি আঘাত গুরুতর হয়নি বটে, কিন্তু তার পেটে চোট লেগেছিল। পেটে তার ছেলে এসেছিল। দু চার দিন পরে তার গর্ভপাত হয় এবং সে পাঁচ সাত দিন পরে মারা যায়। মা অত্যন্ত শোক পান। তাঁর মন ও শরীর ভেঙে পড়ে এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনিও পরলোক গমন করেন।

'শূন্য সংসারে টিকে থাকা আমার অসহ্য হল। বাবার আমলের সর্বাধিকারী কায়স্থ বন্ধুবর্মার ওপর ঘর সংসারের ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয় এমনিই।

'পথে পা দিয়ে মনে হল মালাদের মামার বাড়ীতে যাই, সেখানে তারা কেমন আছে দেখি গিয়ে। খোঁজ করে করে সে গাঁয়ে পৌঁছলুম মাস দেড় দুই পরে। দেখলুম মালার মামাদের শূন্য ভিটা পড়ে রয়েছে। পাড়াপড়শিকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, বছর খানেক আগে মালার মা মারা গেছেন। এক ছিল তাঁর বুড়ো ভাই। মালা তাঁর সেবা করতে থাকে। বুঝলুম, মা ও মামাকে সেবা করবার জন্যেই মালা বিয়ে করতে কিছুতে রাজি হয়নি। মাস দুয়েক

আগে তার মামা স্বর্গত হন। মালাও কাউকে কিছু না বলে দরজায় তালা এঁটে পাড়ার লোকের অজ্ঞাতসারে গ্রামত্যাগ করেছে। কেউ তার কোন সন্ধান জানে না।

'হতাশ হয়ে ভাবতে লাগলুম, এখন করি কী? যাই কোথায়?

'খেয়াল হল উজ্জয়িনী যাই। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম আমার কাকা সেখানকার বড়ো মন্দিরে সেবায়েত ছিলেন। মনে হল আমিও দেবকুলিক হই না কেন।

'এখানে এলুম। পরিচয় দিলুম, দেরি হল না সেবায়েতের সহকারী হতে। কাজে আমার মন বসল। আমি পুরোপুরি সেবায়েত হলুম।

'আনন্দে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটে। দেশের কথা বউয়ের কথা মালার কথা ভুলে গেছি। একদিন সন্ধ্যাপূজার বন্দনা গানের মধ্যে হঠাৎ মনে হল মালা গাইছে না তো। গায়িকাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, তাদের মধ্যে মালা রয়েছে। দেখি, সেও আমাকে দেখছে।

'সন্ধ্যাপূজা সমাধা হলে মন্দারমালা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার মন ভীষণ চঞ্চল হল। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। মালা বললে, মামার দেহত্যাগ ঘটলে ঘর ছেড়ে আমি তোমাদের ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি তুমিও ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়েছ। সেই থেকে আমি ঘুরে বেড়াই। পরে ডাকাতের হাতে পড়ি। তারা আমাকে বিক্রি করতে দাসীহাটে আনে। সেখান থেকে মাথুরিকা আমাকে কিনে নিয়ে উদ্ধার করে। সেই থেকে আমি তার বেশে আছি উজ্জয়িনীতে।

'তার কথা শুনে আমি বললুম, তুমি বেশে আছ? সে বললে, করি কী? পথে পথে বেড়ানোর চেয়ে ভালোই আছি। মাথুরিকা আমাকে মেয়ের মতো দেখে, আমি তাকে মায়ের মতো দেখি। এইসব কথা হচ্ছে এমন সময় মন্দারমালার সঙ্গিনীরা তাকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

'সেই যে দেখা হল তারপর থেকে আমাকে ও আর ছাড়ছে না। সন্ধ্যাবন্দনার গানে আর আসে না বটে তবে সকাল-বেলায় প্রায়ই পূজা দিতে আসে। তখন আমার ওপর পূজার ভার থাকে। তখন বেশি লোকজন থাকে না। সে কেবলি বলে, আমাকে অবগুণ্ঠন দিয়ে তুমি নাও, নিয়ে বাড়ী ফিরে চল। ওকে নিতে আমার মন খুব চায় কিন্তু বেশের মেয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরতে মন চায় না। মহাকালের মন্দির ছাড়তেও খুব ইচ্ছা করে না। ভারি দোটানা।'

কালিদাস বললেন, 'আজ সকালে কী ঘটল বল।'

'আজ সেই একই কথা—"আমাকে ঘোমটা পরিয়ে ঘরে তোল।" রাত্রিতে ভালো ঘুম হয় নি, বড়ো গরম ছিল। সকালে উঠে দেখি মাথাটা খুব ধরেছে। ওর কথায় কেন জানি আমার হঠাৎ মাথা গরম হয়ে উঠল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, "রোজ কী ঘেন ঘেন কর।"

'ও আমার এমন মেজাজ কখনো দেখেনি। ভড়কে গিয়ে পিছু হাঁটল আর অমনি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। আমার দ্বারা দ্বিতীয় স্ত্রীহত্যা ঘটল।

'তার পর সব কথা আমি আগেই বলেছি। এখন আমার শাস্তি বিধান করুন। আমি তা নিতে প্রস্তুত আছি।'

কালিদাস বললেন, 'শাস্তির ব্যবস্থা পরে হবে। এখন তুমি অসুস্থ—শরীরে ও মনে। যাও, তোমার ঘরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নাও। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করো না। কোথাও যেও না। কেমন, কথা দিচ্ছ তো?'

'আজ্ঞে হাঁ।' বলে সোমদত্ত মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কালিদাস বললেন, 'মধু, মন্দিরের দ্বার খুলে দাও। পূজাকর্ম যথারীতি চলুক। তুমি চিঠি লিখে লোক পাঠাও এখুনি মাথুরিকার বেশে এই বলে যে মহাকালের একটি বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে তোমার বেশের গায়িকা মন্দারমালাকে আটকে

রেখেছি দু চারদিনের জন্যে, কোনো চিন্তা করবার নেই।

'আমি এখন চললুম, বিকেলে আসব। তোমার নরযান প্রস্তুত আছে?'

'হাঁ আছে। তুমি নরযান রেখে দিয়ো, বিকালে আবার আসছ তো?'

হাঁ বলে বিদায় নিলেন কালিদাস।

বাড়ী ফিরে এসেই কালিদাস পত্নীকে বললেন, ছজন পালকি বেহারার ভোজনের ব্যবস্থা করতে। তারপর নিজে স্নান আহার করে ইন্দুমতীকে সকালের ঘটনার কথা, সোমদত্ত ও মন্দারমালার ইতিহাস সব জানালেন। শেষে বললেন, 'মেয়েটি যদি বেঁচে যায় তাহলে তোমাকে দিন কতক পুষতে হবে। রাজি আছ?'

'বেশ তো। এখুনি আনতে পার। আমি ঘর ঠিক করে রাখছি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে কালিদাস অভ্যাসমতো একটু যোগনিদ্রার জন্য শয়ন করে চোখ মুদলেন।

অপরাহ্নের প্রথমভাগেই নরযান কালিদাসকে মন্দিরদ্বারে পৌঁছে দিলে। দ্বারী সসম্ভ্রমে তাঁকে যোগিনীমঠের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখলেন বাইরের ঘরে ধন্বন্তরি ও মধুরক্ষিত বসে আছেন তাঁরই প্রতীক্ষায়। কালিদাসকে দেখেই ধন্বন্তরি বলে উঠলেন, 'মেয়েটি বেঁচে যাবে হে, আর কোন ভয় নেই। জ্ঞান হয়েছে, জল খেয়েছে। একটু দুধ টুধ খাইয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পার।'

মধুরক্ষিত বললেন, 'যদি সরানো চলে তবে এখানে ওকে আর না রাখাই ভালো। বিশেষ করে ওর এখন নারীহস্তে শুশ্রূষা পাওয়া আবশ্যক।'

কালিদাস বললেন, 'তা মানি আর অগ্নি ও বেতালকে আর কতক্ষণ আটকে রাখব। দেবপাদের অসুবিধা হতে পারে। ব্যবস্থা

করেছি, ওকে আমার বাড়ীতে তুলব। আমার স্ত্রী দেখাশোনা করতে রাজি হয়েছেন। তবে রাত একটু না ঘনালে গোপনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে কাজ অগ্নি ও বেতালই করবে।'

ধন্বন্তরি বললেন, 'ভালো কথা। তবে তোমার স্ত্রীকে বলো আজ যেন ওকে কিছু খেতে না দেন, জল ছাড়া। কাল সকালে তোমার বাড়ী গিয়ে আমি দেখে পথ্যের ব্যবস্থা করে আসব। এখন চলি।'

ধন্বন্তরি চলে গেলেন, দু বন্ধু বসে রইলেন।

একটু পরে কালিদাস মুখ খুললেন। বললেন, 'দেখ আমার মাথায় একটা চমৎকার কল্পনা এসেছে।'

'কী, কোন কাব্য ফাঁদবে নাকি—'মঞ্জু-মন্দারমালা' নাম দিয়ে?'

'না ভাই, ঠাট্টা নয়। এই বিশ্রী ব্যাপারটিকে খুব সুশ্রী করা যায় মধুরেণ সমাপয়েৎ ন্যায়ে।'

'কী, কী।' কালিদাস মধুরক্ষিতের কানে ফিসফিস করে কিছু বললেন।

মধুরক্ষিতের মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল। চিন্তিত স্বরে বললেন, 'তাতে তো খরচ আছে। জানি তোমার অভাব নেই। আমার সব কথা ভাই জান তো। আমার কিছু সঞ্চয় নেই, বেতন মন্দিরভাণ্ডারেই জমা দিয়ে দিই।'

কালিদাস ধৈর্যহীন সুরে বললেন, 'আঃ, দেখছি তুমি দেবল বামুনের মতো দিন দিন বুদ্ধিশুদ্ধি গুটিয়ে ফেলছ! তোমার টাকা নেই, ঠাকুরের তো প্রচুর ও পর্যাপ্ত আছে। ঠাকুর কি যখ যে সোনা রূপা হীরা মণির উপর চিরকাল তা দিতেই থাকবেন। তাছাড়া চাকরের দায়ে মনিব টাকা না দিলে কে দেবে? তুমি মন্দিরভাণ্ডার থেকে ইচ্ছে মতো নেবে।'

কালিদাসের সরস্বতী ধর্মাধ্যক্ষের মন প্রসন্ন করে দিলে।

একটু পরে মধুরক্ষিত বললেন, 'তোমার কী হবে? তুমি তো ধনী নও।'

কালিদাস বললেন, 'আমি ঠেলে রাজকুল নিমন্ত্রণ করে দেব। সেই পাওনা পর্যাপ্তের চেয়ে বেশি হবে। আর তুমিও যেমন। দেবকুলে আর রাজকুলে তফাৎ কোনখানে? তোমার আর আমার ধর ওই একই হল।'

'স্বীকার করতে হবে, তোমার বুদ্ধি আছে।'

'এতদিনে জানলে!'

সকাল হতে না হতে ধন্বন্তরি এসে মন্দারমালাকে দেখে গেছেন। সে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ। আবশ্যক দু একদিন পূর্ণ বিশ্রাম।

কালিদাস মধুরক্ষিতের কাছে এসেছেন। সঙ্গে রয়েছে বেতাল। রোগিণীর সুস্থতার সংবাদ দিয়ে তিনি সোমদত্তকে ডাকতে বললেন।

সোমদত্ত এল। চেহারা আরও শুখনো। কালিদাস বসতে বললেন। বসল। অধ্যক্ষকে ইসারা করতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কালিদাস বললেন, 'কেমন বোধ করছ আজ?'

'ভালো। আমার শাস্তির বিধান করুন। আমি নারীঘাতক।'

'তুমি নারীহত্যা করেছ কিনা সে বিষয়ে বিচার করবার মতো কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির নেই। শুধু তোমার মুখের কথা।'

'আমার মুখের কথাই কি যথেষ্ট নয়।'

'নরহত্যার দায়ে শাস্তি দেবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। তবে তোমার মনের শান্তির জন্যে তুমি নিজে শাস্তি নিতে পার। যাকে বলে প্রায়শ্চিত্ত।'

'তাই বিধান দিন। আমার মন অশান্ত। বিধান করুন। প্রায়শ্চিত্তও আমি মাথা পেতে নেব।'

কালিদাস চুপ করে ভাবতে লাগলেন, দরজা দিয়ে আকাশ পানে চেয়ে। একখণ্ড সাদা মেঘ ভেসে গেল তাঁর গোচরে। অন্যমনস্ক ভাবে কালিদাস আউড়ে উঠলেন,

"গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতস্ চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।"

এইটুকু বলেই তিনি যেন একটু চমকে গিয়ে থামলেন।

সোমদত্ত প্রণাম করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'বুঝেছি। আমাকে বাঁচালেন।' বলেই সোমদত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কালিদাস বেতালকে ডাকলেন। তাকে চুপি চুপি কিছু বললেন। বেতালও বেরিয়ে গেল।

মধুরক্ষিত ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কি শাস্তিবিধান করলে?'

'পরে বলব। এখন শুনে কাজ নেই। তোমার মনের শান্তিভঙ্গ হবে। আমি ভাবছি, শেষ অবধি ঠেলা সামলানো যাবে তো।'

'তোমার আবার ভাবনা। জিহ্বাগ্রে তো সরস্বতী।'

'ঠাট্টা কর কেন ভাই। আচ্ছা এখন আসি। বিকালে আসব।'

বেলা পড়বার আগেই কালিদাস এসে গেছেন। এসেই জিজ্ঞাসা করেছেন, 'সোমদত্ত কোথায়?'

মধুরক্ষিত বললেন, 'সে মন্দিরের পূজা সেরে স্নান করতে বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। ভাবছি তাকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়েছে কিনা।'

'দুশ্চিন্তা ছাড়ো। যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবিষ্যতি।'—কালিদাস বললেন।

'দুশ্চিন্তা কি ছাড়া যায়?' মধুরক্ষিত বললেন, 'ভাই, আমি বিয়ে করেছি কিন্তু ছেলেপিলে নেই। তবুও একরকম সন্তানস্নেহ আছে আমার এবং তা সকলেরই থাকে। সোমদত্তকে আমার খুব ভালো লাগত।'

'অতীতকাল ব্যবহার করছ কেন? বল, লাগে। আমার মন বলছে ও নিরাপদে আছে।'

খানিকক্ষণ পরে প্রহরী এসে খবর দিলে। গম্ভীরায় স্নান

করতে গিয়ে সোমদত্ত ডুবে যায়। সেখানে নদীর ধার দিয়ে তখন বেতাল যাচ্ছিল। সে তা দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব মেরে তাকে তোলে। পেটে অনেক জল ঢুকেছিল। সব বার করিয়ে দিয়েছে। সোমদত্তকে নরযান করে এখানে আনা হচ্ছে।

মধুরক্ষিত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রহরীকে বললেন, 'পালকি যেন সরাসরি আমার এখানে আসে।' এই বলে তিনি ভিতরে গেলেন ঘর তৈরি রাখতে।

পালকি এল। ধরাধরি করে সোমদত্তকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

বেতালকে এক ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে কালিদাস বললেন, 'কী বল। ধন্বন্তরিকে একবার খবর দেব কি?'

বেতাল বললে, 'না। আবশ্যক নেই।'

'তুমি আমার মুখ রেখেছ,' কালিদাস বললেন।

বেতাল ঈষৎ হেসে বললে, 'আপনার মুখ আপনিই রেখেছেন। আমি তো আপনার নির্দেশ মতো কাজ করেছি।'

কালিদাস চুপ করে গেলেন। সোমদত্তের বন্দোবস্ত করে দিয়ে মধুরক্ষিত বাইরে এলেন। কালিদাস বললেন, 'ভাই, এখন চলি। কাল সকালে আসব।'

কালিদাস সকালেই এলেন, অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরি করে। জিজ্ঞাসা করে জানলেন সোমদত্ত সম্পূর্ণ সুস্থ। তাকে ডেকে পাঠালেন। সোমদত্ত এল। ঘরে আর কেউ নেই।

কালিদাস বললেন, 'সোমদত্ত আমার একটু উপকার করতে হবে।'

'কী, আজ্ঞা করুন।'

'আমার একটি পোষ্য আছে—ধর্মমেয়ে। তার বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে দিতে পারছি না। দেখতে শুনতে মন্দ নয়, লিখতে পড়তে জানে, গানও মন্দ করে না। কিন্তু স্বভাব বড় একগুঁয়ে, বদমেজাজী।

যার তার হাতে দিলে সংসার জ্বালিয়ে দেবে। জেনে শুনে চেনা ঘরেও দিতে পারি না। মেয়ের পছন্দ আছে। ভালো ঘর বর যে পাইনি তা নয় কিন্তু মেয়ের পছন্দ হয়নি।

'আমার মেয়ে তোমাকে দেখেছে। আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি তোমাকে তার অপছন্দ হবে না। মেয়ের দুর্দান্ত স্বভাব তোমার মতো বরের হাতে সংযত হতে পারবে। ও বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতাও আছে।

'জানি তোমার স্বচ্ছল ঘর-গৃহস্থালি। তবুও বলছি আমার মেয়ে শুধু শাঁখা শাড়ি পরে যাবে না। তুমি আমার মেয়েটিকে নিয়ে আমাকে দায়মুক্ত কর।'

সোমদত্ত চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলে। তার পর বললে, 'বেশ। আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো মূঢ়তা আমার নেই। তবে কথা হল এই যে বিয়ে করে আমি দেশে ফিরে যাব।'

কালিদাস বললেন, 'আমিও চাই তুমি বিয়ে করে বউকে নিয়ে পৈতৃক ভিটেতে গিয়ে ওঠ। যদি দুচার দিনের মধ্যেই শুভকর্ম সম্পন্ন হয় তবে কি তোমার অসুবিধা হবে?'

'বিন্দুমাত্র না,' সোমদত্ত বললে।

তিন দিন পরে যথাসম্ভব সমারোহে মধুরক্ষিতের পালিতপুত্র সোমদত্তের সঙ্গে কালিদাসের ধর্মকন্যা মন্দারমালার শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল।

বিবাহের পরের দিন মধ্যাহ্নে দেখা গেল একটি ছোট বিবাহযাত্রীর দল চলেছে নদীর দিকে। নদীতীরে এসে বর-বধূ ও তাদের সঙ্গী পরিচারকেরা বাঁধা নৌকার পুল পেরিয়ে ওপারে গেল। দলের বাকি লোক এপারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নদী পেরিয়ে বর ও বধূ দুটি নরযানে চড়ল। বাঁধ থেকে নেমে পল্লীপথে পালকি অদৃশ্য হল।

কালিদাস নিঃশ্বাস ফেলে ঘরমুখো হলেন।

সেই রাত্রিতে তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথম কল্পনা করেছিলেন।

রাজকৌলীন

কিছুদিন থেকে কালিদাসের মন খারাপ যাচ্ছে, শুধু কালিদাসের কেন নবরত্ন-সভার সকল সভ্যেরই। তবে কম বেশি। বড়োরানী মহাদেবী কুমুদ্বতী মাস তিনেক হল দেহ রেখেছেন। এই তিন মাসেই দেবপাদ যেন বুড়িয়ে গেছেন। রাজকার্যে মন বসে না তাঁর। সাহিত্য-গোষ্ঠীতে রস পান না তিনি। নাটগীত ভালো লাগে না। ছোটরানী ভানুমতী অশেষ চেষ্টা করেও সতীনের স্থান পূর্ণ করতে পারছেন না। কালিদাস নিরানন্দ রাজসভায় যাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন।

সেদিন সকালে স্বামীকে বাড়ীর বাগানে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াতে দেখে পত্নী ইন্দুমতীর মনটা ছাঁত করে উঠল। স্বামীকে তিনি এমন মনমরা বহুকাল দেখেননি। কী হল তাঁর?

কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গো রাজসভা পালিয়ে মুখ শুকিয়ে হন্যের মতো ঘুরছ কেন? তোমার হল কী?'

কালিদাস একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কী আর হবে বল। বড়োরাণীর পরলোকগমনের পর থেকে রাজপুরী নিরানন্দ রাজসভা নীরব। তাই কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।'

'তুমি গিয়ে দেবপাদের মনে খানিকটা শান্তি দিতে পার।'

'কিন্তু আগেকার মতো হাসিখুশির হাওয়া তো আর সভায় বইছে না। আমি একলা কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারি।'

'কিছু মনে করো না, তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমিও যেন মহাদেবীর বিরহে কাতর হয়েছ দেবপাদের মতো।'

কালিদাস থমকে একটু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি জানো না, তুমি কেন কেউই জানে না। তাঁর ও আমার পিঠোপিঠি ভাইবোনের ভালোবাসা ছিল। কচি বয়সে তিনি শ্বশুর-

বাড়ীতে এসেছিলেন, আমিও সেই সময়ে কাঁচা বয়সে রাজসভায় এসেছিলুম। আমার কবিতার সরস্বতী সেই কচি মেয়েটি। আমার কবিতা আশ্রয় করে সেদিনের কিশোর যুবরাজ ও কিশোরী যুবরানীর পরস্পরাশ্রয় প্রেম লতার মতো বেড়ে উঠেছিল। ঋতুসংহারের মনের ও মুখের কথা সেদিনের যুবরাজ—এখনকার মহারাজেরই, লিখে দিয়েছিলুম আমি! যাক সে সব কথা। তবে একটা ব্যাপার তোমাদের জানা নেই। এখন বলছি শোন, শুনে বুঝবে হয়ত।

'খুব বেশি দিনের কথা নয়, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের যেদিন প্রথম অভিনয় হয় রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তা খুব জমেছিল। আমি কণ্ব সেজেছিলুম। অভিনয়ের পরেই তুমি বাড়ী চলে আস, আমি একটু থেকে যাই সাজপোষাক মোচনের জন্যে। হাত মুখ ধুয়ে বেরবার উপক্রম করছি এমন সময় কঞ্চুকী এসে আমাকে অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে গেল। ঘরে ছিলেন দেবপাদ মহাদেবী আর মহামন্ত্রী। আমি ঢুকতেই মহাদেবী এগিয়ে এসে তাঁর কণ্ঠের মুক্তাবলী খুলে নিয়ে তাঁর বাঁ হাতে আমার ডান হাত তুলে ধরে মালাটি তাতে জড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, এ মুক্তাবলী আপনার কণ্ঠে যে ঝুলিয়ে দেব তার উপায় নেই, তাই ধারণী করে হাতে বেঁধে দিলুম —আপনার করপল্লব অজর অব্যর্থ থাকুক। আমার চোখে জল এল, দেবপাদ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।'

'তা সে হার করলে কী তুমি?'

'সে হার আমি ঘরে আনিনি, রাজভাণ্ডারেই জমা করে দিয়েছিলুম। এখনও আমার নামেই জমা আছে।'

'কেন আনলে না ঘরে? আমি নিয়ে নেব বলে?'

'ধরেছ ঠিক। আনিনি এই জন্যে যে মহাদেবীর কণ্ঠমালা তোমার ব্যবহার করা উচিত নয়। শুধু শুধু ঘরে আনলে তোমাকে দুঃখ দেওয়াই হত। কী বল?'

'কী আর বলব। ঠিকই করেছ। তা সে হারের হবে কী?'

'যুবরাজের বিয়ে হলে পরে নববধূকে উপহার দেব। এক মহাদেবীর কণ্ঠমালা আর মহাদেবীর কণ্ঠেই ফিরে যাবে!'

এমন সময় দাসী এসে জানালে রাজবাড়ী থেকে লোক এসেছে। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে জরুরি ডাক দিয়েছেন।

কালিদাস গিয়ে দেখলেন রাজা সেইমাত্র সভাভঙ্গ করে বাইরে এসে সভামণ্ডপের অলিন্দের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। মহামন্ত্রী পাশে। দুজনেই নির্বাক।

কালিদাসকে দেখে রাজা ঘুরে স্বাগত করলেন। তার পর শারদানন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই বলুন।'

শারদানন্দ বললেন, 'বড়ো রাজকুমারের একটা ফাঁড়া গেছে কাল সন্ধ্যায়। তক্ষশিলা থেকে এক প্রখ্যাত নটী এসেছে উজ্জয়িনীতে। বড়ো রাজকুমার সঙ্গীদের নিয়ে কুসুমমালার বেশে গিয়েছিলেন নটীর নাচ দেখতে। নটী সেই বেশেই বাসা নিয়েছে। বেশের নৃত্যশালায় নাচ যখন খুব জমে উঠেছে তখন নটী নাচতে নাচতে তার এক পায়ের নূপুর ছুঁড়ে দিয়েছিল রাজকুমারের দিকে। আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে নটীরা অনেক সময় এই কাজ করে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জানাতে। রাজপুত্র এ কলাবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তিনি নূপুরটি লুফে নিতে হাত বাড়াননি। তাঁর পাশে যে সঙ্গী বসেছিল সে নূপুরটি লুফে নিয়েছিল। সে না নিলে সে নূপুর রাজপুত্রের গায়ে বাজত এবং রাজপুত্র তখনি গতাসু হতেন।'

'কেন?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন অতীতের ঐতিহ্য। স্মরণ করুন।—

"বিষপ্রদিগ্ধেন চ নূপুরেণ দেবী বিরক্তা কিল কাশীরাজম্।"[১]

'নটীর সে নূপুরের ঘুন্টির কাঁটায় বিষ মাখানো ছিল। রাজকুমারের সঙ্গী ছেলেটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে সেইখানে ঢলে পড়ে। দণ্ড

১. 'বিষ মাখানো নূপুর দিয়ে কাশীরাজকে তাঁর রানী হত্যা করেছিল।'

দু'তিন পরে সে মারা যায়। বিষচিকিৎসায় কোন ফল হয়নি।'

কালিদাস দুশ্চিন্তায় পড়লেন। একটু পরে বললেন, 'আশা করি দেবপাদ আমার প্রশ্নে অপরাধ নেবেন না। বড়ো রাজকুমারকে এখন যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে বাধা কোথায়? কেন বিলম্ব হচ্ছে?'

'বাধা একটু আছে।'

'কী বাধা?'

'কুমারের মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। লোকে বলে এক বছর কোন শুভ কাজ করতে নেই।'

'আপনাকে একথা কে বলেছে? বরাহমিহির?'

'না তিনি বলেননি। বলেছেন ছোটরানী। তিনি তো এখন সব দিকেই নজর রাখছেন।'

'আপৎকালে লোকাচার না মানলে কোন দোষ হয় না। আপনি একবার বরাহমিহিরের সঙ্গে পরামর্শ করুন।'

শুকনো মুখে রাজা বললেন, 'তাই করব। কিন্তু উপস্থিত আপদের প্রতিকার চিন্তা করুন।'

কালিদাস বললেন, 'সে চিন্তার ভার আমরা দুজনে নিলুম। আপনি নিরুদ্বিগ্ন হোন। প্রয়োজন হলে অগ্নি ও বেতালকে যেন পাই। এই আদেশটুকু দিয়ে রাখুন।

'তথাস্তু।' বলে রাজা পা বাড়ালেন। কালিদাস ও শারদানন্দ বিদায় নিলেন।

অলিন্দ থেকে নেমে এসে শারদানন্দ বললেন, 'এখন?'

'চলুন কুমারের কাছে যাই।'

'অথ কিম্।'

ভৃত্য জানালে কুমার আছেন তাঁর বিশ্রাম কক্ষে। ভৃত্যকে আগিয়ে গিয়ে খবর দিতে বলে কালিদাস ও শারদানন্দ কুমারের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন। সামনে পুঁথি খুলে বসেছিলেন কুমার, তাঁদের দেখে

উঠে দাঁড়ালেন। কালিদাস বললেন, 'বোস বোস।' মহাকবি ও মহামন্ত্রী আসন গ্রহণ করলে পর কুমার বসলেন।

'কী পড়া হচ্ছিল?' —কালিদাস জিজ্ঞাসা করলেন।

কুমার মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'অগ্নিবেশ-সংহিতা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছিলুম।'

'খুব ভালো বই', কালিদাস বললেন। 'চরককে কবিও বলা যায়, তিনি ঋষি তো বটেনই। দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে চরকের কীর্তিযশ।

'চরকের সংহিতায় খুব ভালো ভালো উক্তি আছে, গভীর জ্ঞানের কথা, সদ্‌বিবেচনার কথা।'—শরেদানন্দ মন্তব্য করলেন।

কালিদাস বললেন, 'তা বটে। তবে সেই সঙ্গে ভুলবেন না—মদ্যেরও উচ্চ প্রশংসা আছে।'

শারদানন্দ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

'যাক্ সে কথা,' কালিদাস বললেন। 'গভীর কাজের কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। মন দিয়ে শোন।'

কুমার উৎসুক নেত্রে কালিদাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

'তোমার মাতৃদেবীর তিরোধানের পর দেবপাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যে ভালো যাচ্ছে না তা তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। সম্প্রতি তাঁর আরও উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। সে উদ্বেগ তোমাকে নিয়ে। তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব কর্মভার প্রায় সবটাই তোমার উপরে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তিবোধ করবেন। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তাঁর দুশ্চিন্তা হল তোমার শারীরিক কল্যাণ নিয়ে। সম্প্রতি যে দু-একটা দুর্ঘটনা তোমাকে লক্ষ্য অথবা উপলক্ষ্য কিংবা নির্লক্ষ্য করে ঘটে গেছে তাতে দেবপাদের দুশ্চিন্তাকে আমরা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। তোমার কুশলের জন্যে দেবপাদ এবং আমরা সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন ও ব্যবস্থা গ্রহণ

করছি। কিন্তু তোমাকেও আমাদের সঙ্গে সহযোগ করতে হবে। আমাদের কথামত তোমাকে চলতে হবে।'

'কিভাবে চলব বলে দিন',—কুমার বললেন।

'প্রাসাদের বাইরে যখন-তখন তোমার যাওয়া চলবে না, যখন যাবে তখন অন্তত একজন—একাধিক হলে ভালো হয়—বিশ্বস্ত পার্শ্বচর রক্ষী সঙ্গে রাখতে হবে। এবং মহামন্ত্রীকে আগে থেকে না জানিয়ে তুমি নগর-তোরণের বাইরে পা বাড়াবে না। আর তোমার প্রতিদিনের বাইরের কর্মতালিকা—যতটা সম্ভব—আগের দিন মহামন্ত্রীকে জানিয়ে রেখো, তাহলে তুমি সর্বদা আমাদের যেন চোখে চোখে থাকবে। এই তিন ধারা মেনে চললেই হবে। একটু অসুবিধা ঘটতে পারে কিন্তু সব দিক ভেবে তোমাকে অল্প কিছুদিন এই অসুবিধাটুকু সহ্য করতে হবে।'

'অল্প কিছুদিন মানে কতদিন?'

'ধর মাস দুয়েক। বরাহমিহির সূর্যের পূর্ণগ্রাস পর্যবেক্ষণ করতে মূলস্থানে গেছেন। গ্রহণ গত মাসে ঘটে গেছে, আর বড় জোর মাস দুয়েকের মধ্যেই তিনি উজ্জয়িনীতে ফিরে আসবেন আশা করছি।'

'আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করলুম। তাই হবে।'

কালিদাস ও শারদানন্দ আসন ছেড়ে উঠলেন। কুমার নত হয়ে প্রণাম বরলেন। দুজনে সমস্বরে আশীর্বাদ করলেন, চিরং জীব।

কুমার দক্ষ অশ্বারোহী, অশ্বারোহণ তাঁর ব্যসন। দু'একদিন অন্তর ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা ঘুরে না এলে তাঁর ভালো লাগে না। নগরের বাইরে যখন-তখন যাওয়া এখন তাঁর নিষিদ্ধ হয়েছে। পদচারী রক্ষী সঙ্গী নিয়ে মুক্ত ভূমিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে উধাও হওয়া যায় না। তাই কুমার ঠিক করলেন উজ্জয়িনীর দক্ষিণ উপকণ্ঠে যে বিস্তীর্ণ কানন আছে সেখানে অশ্বারোহণ ব্যায়াম করতে যাবেন দু-এক দিন অন্তর অন্তর।

মহামন্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হল। একদিন অপরাহ্ণে বেলা যখন তিন প্রহর তখন কুমার দুজন পদচারী রক্ষীকে নিয়ে নগরোপকণ্ঠে গেলেন। কাননের মধ্যভূমি বিশাল ফাঁকা মাঠ, তার চারিদিকে বৃক্ষশ্রেণী একাধিক চক্রনেমির মতো ঘিরে আছে। মাঠের এক ধারে রক্ষীদের রেখে কুমার ঘোড়া হাঁকিয়ে চক্রভ্রমণ করতে লাগলেন। রক্ষীরা একস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। দণ্ড দুই তিন ঘোরবার পর কুমারের মনের অবসাদ দূর হল। সন্ধ্যার আগেই তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই রকমে চলতে লাগল প্রায় পক্ষকাল।

সেদিন কুমার যথারীতি গেছেন কাননে। দু'চারবার পাক দেওয়া হল, আরও পাঁচ সাতবার হবে। নিশ্চিন্ত রক্ষীরা অন্যমনস্কভাবে মাঠের দিকে চোখ রেখে কথা কইছিল। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল ঘোড়া দাঁড়িয়ে, রাজপুত্র পিঠে বসে নেই।

তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। কাছে গিয়ে দেখলে রাজপুত্র অচেতন পড়ে আছেন মাঠে, একটু দূরে ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুমারের নাকে হাত নিয়ে তারা দেখলে শ্বাস বইছে। সন্তর্পণে হাত পা সরিয়ে দেখলে কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা। কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল না। কাছেই একটা বট গাছ। একজন গাছের কাছে গিয়ে দেখলে গাছের উপর কেউ বা কিছু আছে কি না। কিছুই দেখা গেল না। রক্ষীদের একজন ঘোড়ার লাগাম ধরে রইল। আর একজন ছুটল মহামন্ত্রীকে খবর দিতে।

অবিলম্বে এল লোকজন, বেহারার কাঁধে সুখপর্যঙ্ক। আর এলেন দুটি পালকিতে ভিষক্ ধন্বন্তরি ও শারদানন্দ। তাঁদের সঙ্গে এল দুজন বিশ্বস্ত পরিচারিকা। কালিদাস আসেননি। তিনি পর্যবেক্ষণের জন্য বেতালকে পাঠিয়েছেন। তাকে বলে দিয়েছেন, যেস্থানে কুমার পড়ে গিয়েছেন সেখানে এবং তার আশেপাশে সহস্র হস্ত পরিধি স্থানের ঘাসপাতা কাঠকুটো ছাড়া সবকিছু কুড়িয়ে নিয়ে আসতে এবং সেস্থানের নিখুঁত বিবরণ আনতে।

পরিচারিকাদের সাহায্যে ধন্বন্তরি ও শারদানন্দ ধীরে ধীরে কুমারের নিশ্চেষ্ট দেহ শিবিকায় তুললেন। শিবিকা উর্ধ্বশ্বাসে চলল, তাঁরাও শিবিকায় অনুগমন করলেন।

বেতাল চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পর বেতালের অনুসন্ধান কার্য শেষ হল। বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। ঘটনাস্থলে প্রহরী রেখে বেতাল কালিদাসকে খবর দিতে গেল।

কাননভূমির অনতিদূরে ছিল রাজকীয় আম্রবন, সেকালের কথায় সহস্রারাম। আম্রবনের মাঝখানে ছিল প্রমোদভবন। বিক্রমাদিত্য মাঝে মাঝে আমবনে এসে প্রমোদভবনে রাত্রিযাপন করতেন। কোন সম্ভ্রান্ত বিদেশি ব্যক্তি রাজসভার আতিথ্যগ্রহণ করলে তাঁকে সাধারণত প্রমোদভবনে রাখা হত। কুমারকে এই নিভৃত প্রমোদভবনে আনা হল। তখনও তিনি অচৈতন্য। শয্যায় শুইয়ে তাঁর ভূষণ খুলে নিয়ে বসন শিথিল করে দেওয়া হল। ধন্বন্তরি কুমারের নাড়ী পরীক্ষা করে ব্যবস্থা দিলেন কোন ঔষধের আবশ্যক নেই। আবশ্যক শুশ্রূষার —কপালে জলপটি, মাথায় বাতাস আর হাতে পায়ে গরম সেক।

শারদানন্দ লোক পাঠালেন কালিদাস ও কঞ্চুকীকে ডেকে আনতে। তারপর তিনি ধন্বন্তরিকে বললেন, 'কেমন দেখছেন? কী বুঝছেন?'

'আপাতত আশঙ্কার কোন কারণ নেই। মাথার ভিতরে কি হয়েছে তা বলা শক্ত, তবে শরীরে বাইরে কোথাও কিছু গুরুতর আঘাত লাগেনি। মনে হচ্ছে আকস্মিক ভয় পেয়ে পড়ে গিয়ে এই মূর্ছা ঘটেছে। মস্তিষ্কে রক্তচলাচল ঠিকই আছে, হৃৎস্পন্দনে কোন ত্রুটি নেই। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে যদি না আর কোন উত্তেজনা ঘটে।'

'কুমারকে কিছু খাওয়াতে হবে তো?'

'না, এখন নয়। জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে কোন কিছু খাওয়ানো

চলবে না। জ্ঞান হলে জল ও দুধ এবং অন্য কিছু লঘু তরল পথ্য। এখন ও বিষয়ে ব্যস্ত হবেন না। তবে আমাদের রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সে ব্যবস্থা আগেই করেছি। আমার বাড়ী থেকে খাবার আসবে।'

'উত্তমঃ কল্পঃ।'

কুমার যে প্রকোষ্ঠে শয়ান তার পাশের কক্ষে আছেন শারদানন্দ। তাঁর প্রেরিত লোক ফিরে এসে বললে, কালিদাস এখনি আসবেন। অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে কঞ্চুকী উদ্বিগ্ন মুখে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে শারদানন্দের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্র তুললে শারদানন্দ ঘাড় নেড়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর সংক্ষেপে ঘটনাটি শোনালেন।

কঞ্চুকী বললেন, 'তা হলে দেবপাদকে বলা যাবে?'

শারদানন্দ বললেন, 'তাঁকে উপর-পড়া হয়ে কিছু জানাবার প্রয়োজন কী? কুমারের শারীরিক হানির কোন আশঙ্কা নেই আপাতত, সুতরাং তাঁকে এখন আমরা উদ্বেগ দেব না। তবে যদি তিনি কুমারকে খোঁজেন তবে এইটুকুমাত্র নিবেদন করবেন যে, কুমার আম্রবনে প্রমোদ উদ্যানে বিশ্রাম করছেন। দেখবেন কেউ যেন ঘুণাক্ষরে এ দুর্ঘটনার কথা টের না পায়, প্রাসাদের কোন লোকও নয়—তা সে যেই হোক না কেন। আমি কালিদাস ধন্বন্তরি অগ্নি বেতাল ও কুমারের রক্ষীরা ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপার অবগত নয়। এখন আপনি জানলেন। পরিচারিকারা আমার অন্তঃপুর থেকে এসেছে। অগ্নি আছে কুমারের পাহারায়, বেতাল কালিদাসের নির্দেশমত খোঁজে আছে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কঞ্চুকী বললেন, 'খানিকটা ভরসা হল। আমি এখন তবে যাই, অনেকক্ষণ প্রাসাদ ছেড়ে এসেছি। কুমারের জ্ঞান হলে তখনি খবর দেবেন।'

'নিশ্চয়'—শারদানন্দ বললেন।

একটু পরে কালিদাস এলেন। মহামন্ত্রীর কাছে সব কথা শুনলেন, কুমারের ঘরে গিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে স্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর ধন্বন্তরির হাত ধরে তাঁকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনিই এখন ভরসা। দেখবেন শুশ্রূষায় যেন বিন্দুমাত্র শৈথিল্য না হয়। আর একটা কথা, সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হয়। জ্ঞান হলেই আমাদের খবর দেবেন। আমরা পাশের ঘরে আছি।'

'বলা বাহুল্য সে কথা,'—ধন্বন্তরি বললেন।

যে পরিচারিকা কুমারের শিয়রে বসে বাতাস করছিল তাকে কালিদাস ইশারা করে ডাকলেন। যে পরিচারিকা কপালে জলপটি দিচ্ছিল তার হাতে পাখা দিয়ে সে কালিদাস ও ধন্বন্তরির কাছে এল।

কালিদাস তাকে বললেন, 'যে কোন সময়ে কুমারের জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। সেই সময়টির জন্যে তোমাকে সর্বদা সজাগ সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। সচেতন সজ্ঞান হবার মুহূর্তটিতে কুমার কি বলেন কান পেতে শুনতে হবে। কি করেন—অর্থাৎ তাঁর মাথা নাড়া, চাউনি, হাত পা চালনা—এই সবের দিকে নজর রাখতে হবে। আমরা কেউ না কেউ জেগে থাকব। খুব হুঁশিয়ার।'

পরিচারিকা ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেল।

রাত্রি দেড় প্রহরে মহামন্ত্রীর বাড়ী থেকে নৈশ ভোজন-সম্ভার এল। সকলে ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো গ্রহণ করলে। কালিদাস কিছুই খেলেন না, শুধু এক ঘটি জল খেয়ে এক খিলি পান মুখে ফেলে দিলেন।

আহার-পর্ব চুকে গেলে পর রাতের কার্যক্রম স্থির করা হল। কুমারের ঘরে অগ্নি সারারাত জেগে থেকে পাহারা দেবে। আর পরিচারিকা তিনজন পালা করে ঘুমবে—একজন করে। এ ঘরেও সেই রকম ব্যবস্থা। তবে এখানে দু'জন করে ঘুমবেন, একজন জেগে

থাকবেন। আড়াই প্রহর পর্যন্ত ঘুমবেন কালিদাস ও ধন্বন্তরি, জেগে থাকবেন শারদানন্দ। সাড়ে তিন প্রহর পর্যন্ত ঘুমবেন কালিদাস ও শারদানন্দ, জেগে থাকবেন ধন্বন্তরি। শেষ রাত্রিতে ঘুমবেন শারদানন্দ ও ধন্বন্তরি, জেগে থাকবেন কালিদাস।

রাত শেষ হবার মুখে। কালিদাস জেগে আছেন, জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে। লঘুপদে পরিচারিকা এসে বললে, 'জ্ঞান ফিরে আসছে বোধ হয়।' কালিদাস তখুনি পাশের ঘরে গেলেন। দেখলেন কুমার পাশ ফিরেছেন, চক্ষু মুদ্রিত।

অস্ফুটস্বরে কালিদাস পরিচারিকাকে প্রশ্ন করলেন, 'জ্ঞান হবার সময় কিছু বলেছিলেন কি?'

'চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন,—দুটি কথা বললেন, সে কথা ঠিক বুঝতে পারিনি, মনে হল বললেন, "ভালো আছি।" '

'একটু ভেবে বল, কুমারের মুখ থেকে ঠিক কি কথা শুনেছিলে।'

'প্রথমে তিনি যে শব্দ উচ্চারণ করলেন আমার কানে লাগল "ইচ্ছু" বা "উচ্ছু"। আমি আস্তে আস্তে বললুম, "কী বলছেন কুমার?" তখন তিনি বললেন, "আচ্ছ ভল্ল"। এই বলেই তিনি পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। আমি আপনাকে খবর দিলুম।'

কালিদাস পাশের ঘরে ফিরে এসে ধন্বন্তরি ও শারদানন্দকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কুমারের জ্ঞান ফিরে আসছে।'

ধন্বন্তরি শশব্যস্ত হয়ে কুমারের ঘরে গিয়ে কুমারের নাড়ী ও নিঃশ্বাস পরীক্ষা করলেন। ফিরে এসে বন্ধুদের বললেন, 'আর ভাবনা নেই। কুমারের চৈতন্য হয়েছে, এখন ঘুমচ্ছেন। ঘুম ভাঙলে তাঁকে পথ্য দিতে হবে লঘু মুদ্গ-যূষ। তারপর তিন চার দণ্ড পরে যা খেতে চাইবেন তা অল্পস্বল্প খেতে পারবেন।'

শারদানন্দ বললেন, 'বাড়ীতে খবর দিই। আমার স্ত্রী সুপ রেঁধে পাঠিয়ে দেবেন। কঞ্চুকীকেও খবর দিতে হবে, দিই।'

কুমারকে শয্যায় উঠে বসে লঘু পথ্য গ্রহণ করতে দেখে কালিদাস বাড়ী ফিরে এসেছেন। বলে এসেছেন বেতাল এলে যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে যায়। কালিদাস বাড়ী পেঁৗছে দেখেন বেতাল অলিন্দে বসে রয়েছে। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে কবি ভিতরে চলে গেলেন।

তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সেরে নিয়ে বাইরে এসে কালিদাস বেতালকে বললেন, 'কাল তোমার বিবরণ ভালো করে শুনিনি। এখন বল তো।'

বেতাল বললে, 'কাল খোঁজ চালাবার একটু পরেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। তাই ভূমিখণ্ড খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। শুধু এইটুকু দেখেছিলুম যে কুমার যেখানটিতে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে একটা বট গাছের ডাল একটু ঝুঁকে আছে, আর সেই ডালের কচি ডগ ভেঙে ঝুলছে। গাছের তলায় কিছু কাঁচা বটপাতা ছড়িয়ে আছে। পায়ের ছাপটাপ কিছুই দেখা গেল না।'

'বেশ। সেখানে প্রহরী রেখে এসেছিলে তো?'

'আজ্ঞা হাঁ। সেখানে মাছিও ঢুকতে পারবে না।'

'তাহলে এখন আর একবার যাও। গাছটার গুড়ি থেকে ভাঙা ডাল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবে, যেখানে কুমার পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে আশপাশ এক শ হাত পর্যন্ত ভুঁইও তন্নতন্ন করে বেছে বেছে দেখবে। যা পাও—সুতোর খি হোক, লোমের গাছি হোক, কাপড়ের টুকরো হোক, যা কিছু হোক—সন্তর্পণে আমার কাছে আনবে। আমি সহস্রারামে থাকব। যা আনবে তা যেন কোন রকমে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে না যায়।'

'যে আজ্ঞা,' বলে বেতাল অন্তর্হিত হল।

কালিদাস অন্তঃপুরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো যা হয় কিছু চট্ করে দাও। এখনি বেরুতে হবে।'

বাইরে শিবিকা প্রস্তুত ছিল। মনুষ্যবাহ্য যানে চড়ে দ্রুতবেগে

কালিদাস সহস্রারামে চললেন।

সহস্রারামে এসে কালিদাস শুনলেন কুমার ভালো আছেন। একজন সহকারীকে শুশ্রূষার তদারকিতে রেখে ধন্বন্তরি চলে গেছেন। শারদানন্দ যাব যাব করে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন। কালিদাস প্রথমেই কুমারের কক্ষে গেলেন। কুমার শয্যায় অর্ধোপবিষ্ট হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু দূরে এক পরিচারিকা তালবৃন্ত হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বারের পাশে অগ্নি পূর্ববৎ উবু হয়ে বসে ধ্যানমগ্ন।

কালিদাসকে ঢুকতে দেখে কুমার শয্যা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলেন। কালিদাস হাত নেড়ে নিষেধ করাতে তিনি বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসলেন। শয্যার এক প্রান্তভাগে উপবেশন করে কালিদাস বললেন, 'কেমন বোধ হচ্ছে এখন ?'

"ভালো। শরীরে বিশেষ কোনো গ্লানি বোধ হচ্ছে না। এখন প্রাসাদে ফিরে গেলে হয়।'

'যাবে, তবে আজকের দিনটা এখানে কাটানোই ভালো। তোমার মনের বিশ্রাম চাই।—আচ্ছা, বলত কী হয়েছিল ? কেন পড়ে গেলে হঠাৎ ?'

'কিছু তো বুঝতে পারছি না। একটা গাছের কোল ঘেঁষে যাবার সময় মনে হলো একটা কালো কী যেন সামনে ধপ করে পড়ল। ঘোড়া ভড়কে সামনের পা দুটো তুলে যেন খাড়া হয়ে দাঁড়াতে গেল। আমি পড়ে গেলুম। আর কিছুই স্মরণ নেই। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি এখানে রোগী হয়ে শুয়ে আছি। কী ব্যাপার বলুন তো ?'

'চিন্তা কোরো না। সে ভার আমাদের। ব্যাপার শীঘ্রই বোঝা যাবে। আমি এখানেই আছি।'

পাশের কক্ষে এসে কালিদাস শারদানন্দকে বললেন, 'চিন্তা করবেন না। রহস্যের ভেদ অবিলম্বে হবে। আপনি বাড়ী গিয়ে দণ্ড চার-

পাঁচের মধ্যে স্নান আহ্নিক সেরে আসতে পারেন।'

নিশ্চিন্ত মনে শারদানন্দ বাড়ী চলে গেলেন।

বেলা ঠিক দুপুর হতে চলেছে। শারদানন্দের ফিরে আসবার সময় হল। কালিদাস জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছেন—আমগাছের তামাটে নবীন পল্লবে ও সবুজ চিক্কণ প্রবীণ পত্রে সূর্যকিরণের জলতরঙ্গ আর গাছের তলায় রৌদ্রছায়ার যুগলনৃত্য। রহস্যভেদের সূত্র মিলেছে, তাই মন তাঁর এখন ভুবনের প্রতি প্রীতিরসে উচ্ছলিত।

শারদানন্দ এলেন। তার একটু পরে বেতালও এল।

কালিদাস্ বেতালকে বললেন, 'কিছু পেলে কি?'

'হাঁ, পেয়েছি। দেখুন।' বলে বেতাল কড়চ থেকে পাতার ছোট একটি দোনা বার করে সাবধানে ধীরে ধীরে খুলে কালিদাসের সামনে ধরলে। কালিদাস নিরীক্ষণ করে দেখলেন কয়েকগাছি সরু লোম, কালো, কড়া। কোন বড়ো জন্তুর বলে বোধ হয়। কালিদাস লোমগুলি আবার পত্রপুটে মুড়ে তা শারদানন্দের হাতে দিতে বললেন, 'গাত্রাবরণ স্খলিত? অঙ্গস্খলিতও তো হতে পারে! দেখতে তো ভালুক-লোমের মতো।'

'পরে বলব।'

তারপর কালিদাস বেতালের দিকে চেয়ে বললেন, 'কুমারের ঘরে তুমি পাহারা থাকো গে, আর অগ্নিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

অগ্নি আসতেই তাকে বললেন, 'কাল সারা রাত তুমি জেগে পাহারায় ছিলে। আর একটু কষ্ট কর তবেই তোমার ছুটি হবে।'

'কী বলুন।'

নগরের পশ্চিম উপকণ্ঠে দু'এক ঘর নট-ঐন্দ্রজালিক বাস করত বলে শুনেছি। সেখানে, না পেলে যেখানে তারা এখন থাকে সেখানে, গিয়ে গোপনে অনুসন্ধান করে জেনে এস কেউ ভালুকের সাজ চড়িয়ে খেলা দেখায় কিনা। যারা তা করে অথবা কোনো কালে করত তাদের ধরে নিয়ে আসবে। তারা যেন সাজ-পোষাক সঙ্গে নিয়ে

খেলা দেখাতে আসে। হাঁকডাক ক'রো না, শুধু বোলো রাজপ্রাসাদে এখনি খেলা দেখাতে হবে। তাদের সোজা এইখানে নিয়ে আসবে।'

'যে আজ্ঞা।' অগ্নি ধাবমান হল।

শারদানন্দ ও কালিদাস দুখানি চৌকিতে মুখোমুখি হয়ে বসলেন। শারদানন্দ বললেন, 'এখন রহস্যভেদ ও সমাধান।'

একটা পান মুখে দিয়ে কালিদাস বললেন, 'জ্ঞান ফিরে আসার মুহূর্তটীতে অর্ধসচেতন কুমারের মুখ দিয়ে যে দুটী কথা বেরিয়েছিল তা আপনি শুনেছেন কী?'

'হাঁ, শুনেছি। কুমার বলেছিলেন প্রথমে "ইচ্ছ" পরে "অচ্ছ ভল্ল"। প্রথম কথাটির কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে করি না, তবে দ্বিতীয়টির আছে।'

'কি অর্থ মনে করেন দ্বিতীয় কথাটির?'

'কেন?—"ভাল আছি", অথবা প্রশ্ন "ভাল আছ?"'

কালিদাস হেসে ফেললেন। বললেন, 'হাসলুম বলে অপরাধ নেবেন না। পরিচারিকাও ওই রকম অর্থ করেছিল। তা নয়। ওই কথা দুটি আমাকে দিয়েছে অপরাধীর হদিশ। "ইচ্ছ" নিরর্থ প্রলাপোক্তি নয়। কথাটির মানে ভালুক, দেববাণী "ঋক্ষ" থেকে। কুমারের মামার বাড়ী যে দেশে সেখানে লোকভাষায় "ঋক্ষ" হয়েছে "ইচ্ছ"। আর "অচ্ছভল্ল"ও তাই, মানে ভালুক, এসেছে "ঋক্ষভদ্র" থেকে। ওটি পূর্বাঞ্চলের মেয়েলি ভাষার শব্দ, মানে ভালো মানুষ ভালুক। যে পরিচারিকা কুমারের মাথার কাছে বসে বীজন করছিল তার বাড়ী পূবদেশ। তাকে দেখেই বোধহয় কুমার দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। তার পর তিনি তখনি ঘুমিয়ে পড়েন অবসন্নতায়। পূরোপূরি জ্ঞান হবার পর তাঁকে ও বিষয়ে কোন প্রশ্ন ইচ্ছে করেই করিনি। কেননা দুর্ঘটনার স্মৃতি তখনি জাগরূক হলে তিনি আবার ভয় পেয়ে চেতনা হারাতে পারতেন। কুমারের অর্দ্ধ-সচেতন উক্তি থেকে আমি ধারণা করেছি যে ঘোড়ার সামনে গাছ থেকে হঠাৎ

ভালুক লাফিয়ে পড়ায় ঘোড়া ভড়কে যায় আর অপ্রস্তুত কুমার পড়ে যান। অকুস্থলে কয়েকগাছি ভালুকের লোম পাওয়া যেতে আমার অনুমানের সমর্থন মিলল।'

'বেতাল যে লোম কটি আনলে তার থেকে তুমি কিসে বুঝলে যে তা ভালুকের গা থেকে খসে পড়া নয়, মানুষের গায়ে চড়ানো ভালুকের ছাল থেকে? কিছু মনে করো না, আমি জেরা করছি না। আমি শিখতে চাইছি।'

'বেশ যাহোক। আপনি মহামন্ত্রী শারদানন্দ, আমার কাছে চোরধরা বিদ্যা শিখবেন? যাক্। স্মরণ করুন কাল বিকেলের ঘটনা ও ঘটনাস্থল। কুমার যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে পড়ে ছিল বটগাছটির গোটা কতক কাঁচা পাতা ও একটা ভাঙা ডাল। যে জীব ঘোড়ার সামনে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছিল সে ওই ডালটি ধরেই তা করেছিল। সে জীব ভালুক হতে পারে না। ভালুক কখনও অত নরম ডালে যায় না। ও অত উঁচু থেকে লাফ দেয় না। ভালুক হলে গুঁড়ি বেয়ে নেমে আস্‌ত। ওরকম ভাবে ঝাঁপ খেতে পারে মানুষ ও বাঁদর। অমন কালো লোম বাঁদরের হতে পারে না। বহুরূপীরা ভালুকের ছাল পরে ভালুক সাজে,—সে কথা আপনার আমার অজানা নয়। এখন অপেক্ষা করে দেখা যাক আমার এই অনুমান প্রমাণিত হয় কি না।'

'উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ ছাড়া তোমাকে দাতব্য আর কিছু নেই।'

নগরের অপরপ্রান্ত থেকে ঘণ্টাধ্বনি বাতাসে ভেসে এসে জানিয়ে দিলে মহাকালের মধ্যাহ্ন ভোগপূজা সমাপ্ত হয়েছে। তখন সহস্রারামের অতিথিরাও সব ভোজনে বসে গেলেন। মহামন্ত্রীর পত্নী অপর্যাপ্ত ভোজ্য পাঠিয়েছেন। কুমারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—লঘু পথ্য। সে পথ্যের তালিকা করে দিয়েছেন ভিষক্ ধন্বন্তরি চরক-সংহিতা দেখে।

ভোজন সমাপ্ত হলে পর হাতমুখ ধুয়ে পান মুখে দিয়ে শারদানন্দ ও

কালিদাস অলিন্দে এসে একান্তে বসলেন। অপেক্ষায় রইলেন অগ্নির প্রত্যাগমনের।

অগ্নি এল দুটি লোককে নিয়ে। সঙ্গে তাদের দুটি হালকা বোঝা। বোঝা গেল তার মধ্যে আছে নট-বহুরূপীর সরঞ্জাম। লোক দুটির মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, বৃদ্ধ বলা চলে, দীর্ঘ সুঠাম অঙ্গ, নাতিস্থূল নাতিকৃশ। অপর লোকটি অল্পবয়সী, কিঞ্চিৎ খর্বকায়। সেও নাতিস্থূল নাতিকৃশ। দু'জনের মাথার ডৌল ও মুখের সাদৃশ্য নজরে পড়ে। দেখলেই বোধ হয় তারা দু ভাই কিংবা বাপ বেটা।

লোক দুটি শারদানন্দের সামনে নতজানু হয়ে নমস্কার করলে।

বৃদ্ধ বললে, 'কি খেলা দেখাব আজ্ঞা করুন।'

শারদানন্দ বললেন, 'কাল তোমরা যা খেল দেখিয়েছ তাই যথেষ্ট। আজ আর কি খেলা দেখব?' তারপর কালিদাসকে নির্দেশ করে বললেন, 'ইনি অভিযোগ করছেন যে তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন কাল বিকেলে ভালুক সেজে বড়ো কুমারকে ভয় দেখিয়েছিলে। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। মহাকালের কৃপায় তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু আমাদের বিচারে তোমরা তো বাঁচবে না। তবে সত্য কথা যদি বল মহাকাল আমাদের বলতে পারেন তোমাদের কৃপা করতে। এখন বল কে ও কাজ করেছিলে? কেন করেছিলে?'

ভয় পেয়ে দু'জনেই বলে উঠ্‌ল, 'হুজুর, আমি করেছি।'

শারদানন্দ কালিদাসের দিকে চাইলেন। কালিদাস বৃদ্ধকে বললেন, 'ও তোমার কে হয়?'

'আমার ছেলে হুজুর।'

'পুত্রস্নেহ ভালো। মিথ্যা কথা ভালো নয়। আচ্ছা তুমি যদি কাল খেল দেখিয়ে থাক তো বল ঠিক কি কি করেছিলে।'

বৃদ্ধের মুখে আর কথা সরে না। বোঝা গেল, মিথ্যা কথায় সে রপ্ত নয়, চালাকও নয়।

কালিদাস তার ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাদের দেখছি

একটি মাত্র ভালুক চাম। সেটি তোমার গায়েই মাপসই হবে বলে মনে হচ্ছে, একবার পরে দেখাও তো।'

ছোকরা বোচকা থেকে বার করে ভালুকের চামড়াটা গায়ে দিলে। কালিদাস বললেন, 'হাত পা গুটিয়ে ভালুকের মতো চল দেখি।'

ঠিক যেন আস্ত ভালুক।

কালিদাস তাকে বললেন, 'কে তোমায় কী বলেছিল খেলা দেখাবার জন্যে?'

'হুজুর, গত পরশু দিন রাজবাড়ীর এক লোক এসে আমার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললে, কাল বিকেলবেলা দণ্ড তিন চার থাকতে তুই ভালুক সেজে কাননে যাবি। বড়ো কুমার তোর খেলা দেখবেন। খুশি হলে বকশিশ দেবেন। আমি বললুম, ঠিক কোন্ জায়গায় খেলা দেখাব। কানন তো একটুখানি ভুঁই নয়। সে বললে, তুই ভালুক সেজে পশ্চিমদিকে বড়ো বট গাছটায় চড়ে বসে থাকবি। কুমার ঘোড়ায় চড়ে চক্রভ্রমণ করবেন। তাক বুঝে তুই গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নাচ দেখাবি, কুমার খুব খুশি হবেন। আমি রাজি হলুম।'

'কাননে গিয়ে কী করলি বল্।'

'আগে থেকে গিয়ে সাজ চড়িয়ে গাছে উঠে বসে রইলুম। দু'চার পাক ঘুরে কুমার যেই আবার সেই গাছতলায় এসেছেন অমনি আমি ঘোড়ার নাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম। ঘোড়া ভড়কে গেল। কুমার পড়ে গেলেন। ভয়েময়ে আমি গাছটার পাশে যে ঝোপ ছিল তার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তার পর ঝোপের পর ঝোপ ঘুরে ঘুরে বাড়ী ফিরে আসি সন্ধ্যার পরে। হুজুর, আমার কসুর হয়েছে···কিন্তু জেনে শুনে করিনি। কুমারের গায়ে একটি আঁচড় ঠেকাতে আমরা প্রাণ দিতে পারি। ক্ষমা করুন আমাদের।'

কালিদাস একটু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি যে জেনে শুনে কোন অপরাধ করোনি তা ঠিক। করেছ নির্বোধের কাজ। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে শাস্তি আমরা দেব

না। তোমাদের জীবিকা-কাজ হল বুদ্ধির দৌড়। তোমাকে যে প্রাপ্য দিতে চাই তা তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে শাস্তি। কিন্তু মহাকাল ক্ষমা করতে বলছেন। তিনি আরও বলছেন কিছু পুরস্কার দিতে, কেন না তুমি সত্য কথা বলেছ। মহামন্ত্রী হুকুম দিচ্ছেন তোমরা দু'জনে দু'টি সোনার মোহর নিয়ে যেয়ো। মোহর এখনি পাবে।'

শারদানন্দ কালিদাসের পিঠ চাপড়ালেন। তাদের দু'টি মোহর দিলেন।

তারপর অনেককাল কেটে গেছে। কালিদাস বুড়ো হয়েছেন, বিক্রমাদিত্য যেন আরও বুড়ো। যথাকালে যুবরাজের বিবাহ ঘটেছে। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে জন্মেছে। ছেলের বয়স আট মেয়ের বয়স পাঁচ।

দু'জনেই কালিদাসের অনুরক্ত ভক্ত, কালিদাস দু'জনেরই ভক্ত দাস। তাঁকে ভক্তির যোগান দিতে হয় গল্প বলে। দেখা পেলেই নাছোড়-বান্দা দু'জনে বৃদ্ধ কবির দু'হাত টানাটানি করে আর বলে, গল্প বল। গল্প বলে বলে হয়রান হয়ে গেছেন কবি।

মুখে বলেন, আর তো পারি না। মনে মনে কিন্তু নতুন গল্পের সুতো পাকাতে থাকেন। ছেলেরা সে গল্প শোনে, বলে আরও নতুন গল্প বল।

একদিন অপরাহ্নে কালিদাস রাজপ্রাসাদে গিয়ে আটক পড়ে গেছেন। অঘোর বাদল নেমেছে। বাড়ী ফেরা দায়। সেদিন কুমার কুমারিকা দু'জনে তাঁকে জাঁতিকলে ধরে বসেছে, আজ নতুন গল্প বলতেই হবে। খুদে কুমার বললে, আজ একদম টাটকা নতুন গল্প চাই। খুদে কুমারী বললে, আজ কিন্তু পচা গল্প নয়—টাটকা সত্যি গল্প চাই।

এমনি কারে পড়ে কালিদাস তাদের সেদিন যে গল্পটি শুনিয়েছিলেন তা সেদিনকার টাটকা নতুন এবং সত্যি গল্প। এ গল্পটি কালিদাস

কপিরাইট রাখতে পুথিবদ্ধ করেননি, শিশু দুটিকে নিঃস্বত্ব দান করেছিলেন। পুথিবদ্ধ না হলেও কালিদাসের সে কাহিনীর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি। সেদিনের ধারামুখর আষাঢ় সন্ধ্যায় উজ্জয়িনীর রাজ-প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে চঞ্চল দীপালোকে দুটি মুগ্ধ শিষ্যকে যে গল্পটি বলেছিলেন তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কালস্রোত বেয়ে এসে একালের শিশুর কানেও পৌঁছেছে—সসেমিরার গল্প ॥